বাঙালী মুসলিম পুনর্জাগরণে কয়েকজন বাঙালী সাহিত্য-সাধক

আ.শ.ম. বাবর আলী

বাঙালি মুসলিম পুনর্জাগরণে কয়েকজন বাঙালি সাহিত্য সাধক

আ. শ. ম. বাবর আলী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

বাঙালি মুসলিম পুনর্জাগরণে কয়েকজন বাঙালি সাহিত্য সাধক
আ. শ. ম. বাবর আলী

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৩২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২৮.৯১৪৪
ISBN : 984-06-0475-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৮
আষাঢ় ১৪০৫
সফর ১৪১৯

প্রকাশক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
আবদুল আযীয

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ২৩.০০ টাকা মাত্র

BANGALI MUSLIM PUNARJAGARANE KOEKJON BANGALI SAHITYA SADHAK (Some Litterateur of Bengal in the Muslim Renaissance of Bengal): written by A. S. M. Babar Ali in Bengali and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.
June 1998

Price : Tk 23.00 ; US Dollar : 1.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ মানুষকে নতুন প্রেরণা যোগানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে। নিজের মত আর ক'জন মানুষ কিভাবে জীবনে উন্নতি করতে পেরেছেন–সমাজের জন্য, জাতির জন্য, আদর্শের জন্য নিজেকে বিলীন করে দিতে পেরেছেন; সে সব ইতিহাস ও জীবন কথা পাঠক সমাজকেও উদ্দীপ্ত করে তোলে। নবীনদের জীবনে প্রাণশক্তির সঞ্চার করে প্রবীণদের কর্মকাণ্ড ও তাদের কাহিনী। সমাজকর্মী ও সমাজ সংস্কারকগণ তাই জাতির উল্লেখযোগ্য কৃতি সন্তানদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন সমসাময়িক পরিবেশে।

"বাঙালি মুসলিম পুনর্জাগরণে কয়েকজন বাঙালি সাহিত্য সাধক" শীর্ষক বইটিও এমনি ধরনের সাহিত্যকর্ম। জনাব আ. শ. ম. রাবর আলী বিরচিত উক্ত গ্রন্থ আমাদের ইতিহাস–ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে আশা করি।

বইটি কয়েকজন সাহিত্য সাধকের জীবনকর্ম তুলে ধরেছে আমাদের সময়কার পরিবেশের জন্য। তাই এটি আজকের তরুণদের জীবনপথে যোগাবে নতুন উৎসাহ–উদ্দীপনা, কর্মজীবনে তারা উদ্বুদ্ধ হবে জাতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মুখপানে। এই আশায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বইটি প্রকাশ করা হলো।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন/১
আলাউদ্দীন আহমদ/৪
মোহাম্মদ নজিবর রহমান/৮
মোহাম্মদ দাদ আলী/১২
রেয়াজ আল-দীন আহমদ মাশহাদী/১৫
মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ/১৯
শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন/২৩
খানবাহাদুর আহছানউল্লা/২৭
মোহাম্মদ মোয়েজজদ্দীন হামিদী/৩০
শেখ আব্দুল জব্বার/৩৫
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী/৩৯
ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান/৪৪
এস. ওয়াজেদ আলী/৫১
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী/৫৫
আশরাফ আলী খান/৫৯

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন

(আল্ কুরআনের প্রথম মুসলিম বাংলা অনুবাদক)

১৮৩২ সালে ময়মনসিংহ জেলার সুরুজ গ্রামে মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন ধর্মপ্রাণ জ্ঞানী মুসলমান ছিলেন। আরবী-ফার্সীসহ বিভিন্ন ভাষাতে তাঁর পিতার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। পিতার নিকট থেকে অতি শৈশবে উক্ত দু'টি ভাষা তিনি শিক্ষালাভ করেন। সে সময় ভাষা দু'টি ছিল মুসলমানী ভাষা। তার অবশ্য একটা কারণও ছিল। আরবী মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। আর ফার্সী ছিল বিশেষ ভাষা। এদেশে বিদেশী ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের ভাষা। তাছাড়া বিশ্বের মুসলিম বীর মনীষীদের অমর কীর্তি-কাহিনী এ ভাষাতেই রচিত ছিল। এজন্য পিতার নিকট থেকে এই দু'টি ভাষা তিনি পরম আগ্রহের সাথে শিক্ষালাভ করতে থাকেন।

কিন্তু প্রবল জ্ঞানস্পৃহা তাঁকে বেশিদিন গৃহকোণে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তাই অধিকতর জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তিনি চলে যান ঢাকায়। সেটা বাংলা ১২৫২ সালের কথা। ঢাকাতে তিনি বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষালয় ও মনীষীদের সাহচর্য লাভ করেন। এখানে আরবী-ফার্সী ছাড়াও বাংলা-উর্দুসহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষাতে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। বিভিন্ন মনীষীর কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কিন্তু এতেও তাঁর জ্ঞানস্পৃহার সমাপ্তি ঘটলো না। তাই ঢাকাতে আট বছর অবস্থানের পর অধিকতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা ১২৬০ সালে যাত্রা করলেন উপমহাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে। এসব স্থানের মধ্যে দিল্লী, আগ্রা, জৌনপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব স্থানের মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত কীর্তিসমূহ পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর সাহচর্য লাভ করেন, যা তাঁর জীবনের জ্ঞানভাণ্ডারকে বিশেষ প্রাচুর্য প্রদান করে, যার জন্য তৎকালীন মুসলিম সমাজ তাঁকে 'আলেম-উদ্-দহর' অর্থাৎ 'জ্ঞান সমুদ্র' বা 'জ্ঞানভাণ্ডার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

www.pathagar.com

এরপর শুরু হয় এদেশীয় মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁর জ্ঞান বিকাশের সাধনা। সর্বপ্রথম তিনি লক্ষ্য করলেন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতাই বাঙালি মুসলমানদের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। দুঃখিত চিত্তে তিনি উপলব্ধি করলেন, ইসলামী জ্ঞান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে এদেশের মুসলমানরা। এ ব্যাপারে অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ। এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য বাংলা ভাষায় কোন কিতাব নেই। স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয় মূল আরবী ভাষা থেকে উক্ত জ্ঞান আহরণ করা। তাই উক্ত বিষয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজকে জ্ঞাতকরণের উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন 'জোব্বাতুল মাসায়েল' বা মুসলমান ব্যবস্থা নামে পুস্তকখানি। অনেকগুলি আরবী ও ফার্সী ভাষার নামকরা পুস্তক থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় এই পুস্তকখানি তিনি রচনা করেন। বালক ও শিক্ষকের ভূমিকায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এটি রচিত হয়। দু'টি খণ্ডে সমাপ্ত পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৮০ সালে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৮৭ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৫৫। প্রথম খণ্ডের পরপর দশটি ও দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতেই তৎকালীন মুসলিম সমাজে পুস্তকখানির জনপ্রিয়তা অনুমেয়।

পবিত্র কুরআন শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদক ছিলেন গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৬–১৯১০)। তাঁর এই মহৎ কর্মের জন্য এদেশীয় মুসলিম সমাজ তাঁকে 'ভাই' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তাই 'ভাই গিরীশচন্দ্র সেন' নামেই তাঁর পরিচিতি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মুসলমান বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন একটি মহৎ কর্মের জন্য কেউই এগিয়ে আসেন নি। এর দু'টি কারণ হতে পারে। এক. আরবী ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব; দুই. অলসতা।

মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন ছিলেন আরবী ভাষার একজন সুদক্ষ আলেম। মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ তাঁর সাধনাকে পূর্ণভাবে জয়ী করেছিল। বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হয়ে মুসলমান বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোটা কার্য তিনি সম্পাদন করে যেতে পারেন নি। তার আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। মোট ২৩ পারা তিনি অনুবাদ করতে সক্ষম হন। তাঁর অনুবাদে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল টীকা প্রদান। অনুবাদের বিভিন্ন অংশে সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রয়োজনীয় টীকা প্রদান করে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলেন। এজন্য তৎকালীন বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারক'–এ তাঁর সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসা করা হয়। পবিত্র কুরআন শরীফের সমগ্র অনুবাদ কার্য তিনি সম্পাদন করে যেতে না পারলেও, যেটুকু তিনি

www.pathagar.com

করেছেন এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রথম পথিকৃৎ হয়েছিলেন, সেজন্য এদেশীয় মুসলিম সমাজ তাঁর কাছে চির ঋণী। তিনি 'আমপারা'র বঙ্গানুবাদ করেন। এটিও তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়।

আল্ কুরআনের সাথে পবিত্র হাদীস শরীফ মুসলমানদের পবিত্র পাথেয়। তাই আল্-কুরআনের মত একই উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়ে তিনি অনুবাদ্ করেন পবিত্র 'বুখারী শরীফ'। এটিও তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

'ফতোয়ায়ে আলমগীর' ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে একখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের নির্দেশনা সম্বলিত এ পুস্তকখানি তিনি অতি সুন্দর ভাষা ও দরদ দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের জন্য অনুবাদ করেন। মোট চারটি খণ্ডে এটি সমাপ্ত।

এ ছাড়া তাঁর অনূদিত আরও ছয়খানি পুস্তক সম্পর্কে জানা যায়। সেগুলি হচ্ছে-(১) কলেমাতুল কোফর, (২) সেরাতুল মোস্তাকিম, (৩) আখেরে জোহর, (৪) এনসাফ, (৫) আদেল্লায় হানাফিয়া এবং (৬) রফাদায়েন। সবগুলি পুস্তকই যে অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ নয়, মুসলিম সমাজের খিদমত— এ বিষয়ে কোনরকম সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ ছাড়া হাফেজ মাহমুদ আলীর প্রকাশনায় 'আখবারে ইসলামীয়া' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হতো তাঁর সম্পাদনায়। এতে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর লেখা সম্পাদকীয় ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন একজন যুক্তিবাদী ধর্মীয় বক্তাও ছিলেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বিভিন্ন ওয়াজ মাহ্ফিলে বক্তৃতাদানের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণে এক নির্ভীক শক্তিধর সৈনিক হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেন। এমনি করে বাঙালি মুসলিম সমাজের একজন অকৃত্রিম দরদী রূপে তাঁদের হৃদয়ে সমাসীন হন।

এ দেশের মুসলিম সমাজের কল্যাণে গোটা জীবনের সাধনাকে বিলিয়ে দিয়ে ১৯১৬ সালে দীর্ঘ ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

আলাউদ্দীন আহমদ

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশের বিপর্যস্ত মুসলমান সমাজকে ধর্মীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সুষ্ঠু জীবন গঠনের সহায়তা প্রদানের জন্য যে কয়জন মুসলমান লেখক লেখনী ধারণ করেছিলেন, আলাউদ্দীন আহমদ তাঁদের অন্যতম।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা–মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাই শৈশব থেকেই পুত্রকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে ব্রতী হন। গ্রামের এক মক্তবে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। সেখানে তিনি মাতৃভাষা বাংলার সাথে আরবী ও ফার্সী ভাষাও শিক্ষালাভ করতে থাকেন। শৈশবকাল থেকেই উক্ত দু'টি ভাষাতেই তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে উভয় ভাষাতেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে থাকেন। যথাসময়ে গ্রামের মক্তব ও মাদ্রাসা থেকে ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি বেশ কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদকে তাঁর শিক্ষক হিসেবে পান। তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানলাভের স্পৃহাকে অধিকতর বলিষ্ঠতা দান করে এবং উক্ত বিষয়ে তাঁর জ্ঞানার্জনে সহায়ক হয়। কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ফিরে আসেন দেশে এবং ফরিদপুর জেলা স্কুলের আরবী ও ফার্সী ভাষার শিক্ষক পদে চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর বাড়িতেই ফিরে যান। চাকরি জীবনে ভবিষ্যতের জন্য কিছুই তিনি সঞ্চয় করতে পারেন নি। তাই আর্থিক দীনতার জন্য তাঁকে অন্য পথের সন্ধান করতে হয়। অবসর জীবনে জীবিকার্জনের জন্য বাধ্য হয়ে তিনি পাবনার শাহজাদপুরে 'ম্যারেজ রেজিস্টাররূপে কাজ করতে থাকেন। উক্ত পেশাতেই তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি কেটে যায়।

আলাউদ্দীন আহমদের যখন জন্ম, তখন এদেশীয় মুসলমানগণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক চরম সংকটময় আবর্তে অবস্থান করছিলেন। আলাউদ্দীন আহমদ উপলব্ধি করলেন, ধর্মীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য থেকে পেছনে পড়াই তাঁদের এই সংকটের মূল কারণ। এক্ষণে এদেশের পশ্চাৎপদ অবহেলিত

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁদের নতুন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব—একথা অত্যন্ত গভীরভাবে তিনি উপলব্ধি করলেন। তাই মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে পুনর্জাগরণের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করলেন।

মুন্‌শী রিয়াজউদ্দীন আহমদের 'ইসলাম প্রচারক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সে সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে এদেশীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে বিস্তার ঘটানো ছিল পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। স্বীয় উদ্দেশ্য সফলতার জন্য আলাউদ্দীন আহমদ ছাত্র জীবনেই এই পত্রিকাখানিকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। এতেই শুরু হয় তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য চর্চা।

আলাউদ্দীন আহমদ বুঝেছিলেন এদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণের জন্য সবার আগে প্রয়োজন প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের ঐতিহ্যময় জীবনাদর্শ ও কীর্তিকে অবগতকরণ। তাই 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকাতে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর জীবনী লিখতে লাগলেন। এসব আদর্শ মুসলিম পুরুষদের মধ্যে ইসলামের চার খলীফা, বিশ্ববিখ্যাত বীর মূসা ও তারেক, প্রখ্যাত ফার্সী কবি শেখ সাদী, হাফিজ, প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিক মওলানা রুমী, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ অন্যতম। এসব জীবন-কাহিনী লিখে এদেশীয় মুসলমান সমাজে তিনি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন। এদেশীয় মুসলিম পাঠক সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশি বেড়ে যায় যে, এর ফলে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তিনি অন্তত একটি করে লেখা দিতে বাধ্য হন। শুধুমাত্র জীবনী রচনা নয়, প্রখ্যাত মনীষীদের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা-দীক্ষাকে এদেশীয় অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর সাধনা। এটাই তাঁর জনপ্রিয়তার বিশেষ কারণ।

তাঁর লেখা বেশ কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম পুস্তক 'ওমর চরিত'। বিভিন্ন আরবী ও ফার্সী গ্রন্থের সহায়তায় এটি তিনি রচনা করেন। বাংলা ভাষায় হযরত ওমর (রা)-এর জীবনী এটিই প্রথম বলে গবেষকরা মনে করেন। 'ইসলাম জ্ঞানভাণ্ডারে লুকিয়ে থাকা বহুমূল্য রত্নরাজিকে বঙ্গ মুসলিম সমাজে উন্মোচন করাই পুস্তকখানি রচনার উদ্দেশ্য' বলে পুস্তকখানির ভূমিকাতে লেখক উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য পুস্তকে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর চারিত্রিক আদর্শ ও গুণাবলীকে লেখক বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন। পুস্তকখানির ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। পাণ্ডিত্য প্রমাণ নয়, এ দেশের স্বল্প শিক্ষিত মুসলমান সমাজকে সচেতনকরণই ছিল লেখকের লক্ষ্য, পুস্তকখানি পাঠে তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

www.pathagar.com

বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র)-র পবিত্র জীবনাদর্শ বর্ণনা করে তিনি রচনা করেন 'বড় পীরের জীবনী'। এতে হযরত বড় পীর সাহেবের অধ্যাত্ম জীবনের সাথে বর্ণিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ মানবতার কিছু তথ্য এবং দৈনন্দিন সুষ্ঠু জীবনযাত্রা প্রণালী। এ ছাড়া পরিবেশিত হয়েছে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা। একজন মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যে কত মহৎ এবং নিরহংকারী হতে পারেন, সেটাই তিনি দেখিয়েছেন উক্ত গ্রন্থে। তাঁর জীবনের এতবড় ক্ষমতারোহণের মূল কারণ ইসলাম ধর্মের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা, অতি সুন্দরভাবে সে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। হযরত বড় পীর সাহেবের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সুলতানুল হিন্দ আজমীর শরীফের খাজা বাবা হযরত মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (র)-র প্রসঙ্গ এনেছেন। খাজা বাবাকে উল্লেখ করেছেন এ দেশীয় মুসলমানদের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে। তাঁর আদর্শে আদর্শায়িত হওয়ার জন্য এদেশের মুসলমান সমাজকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। এটাই এদেশের মুসলমান সমাজের অধঃপতন থেকে মুক্তির অন্যতম পথ বলে আশাবাদী হয়েছেন।

প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করে বাংলার মুসলমান সমাজকে তিনি সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। যখন তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর সে প্রয়াস কার্যকরী হয়েছে, তখনই তিনি তাঁর সাধনার লক্ষ্য এবং ক্ষেত্রভূমি প্রশস্ত ও পরিবর্তন করেছেন। এ দেশের গোটা মুসলমান সমাজকে ইসলামী আদর্শে আদর্শায়িত করার জন্য ব্রতী হয়েছেন। তাদেরকে ইসলামের রীতিনীতি এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবন বিধানে পূর্ণতা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে রচনা করলেন তিনি 'আহ্‌কামল ইসলাম' পুস্তকখানি। এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। মুসলমানদের সুষ্ঠু জীবন যাত্রার দৈনন্দিন পাথেয় রয়েছে এ গ্রন্থে। এর অনুসরণে শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠন সম্ভবপর। শুধু সম্ভবপরই নয়, একমাত্র উপায়ও বলা যেতে পারে।

একই উদ্দেশ্যে 'তফছিরে হক্কানী' নামে একখানি পুস্তক তিনি রচনা করেন। এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ এবং পবিত্র কুরআনেরই অনুবাদ ও তফসীর। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকাতে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পৃথক পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সঠিক জানা যায় না। কারণ, পুস্তকখানির 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অংশসমূহ ছাড়া আর কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে এমনও হতে পারে, হয়তো পুস্তকাকারে এটি ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সে সময়কার অনেক লেখকের অনেক পুস্তকের মতো সংরক্ষণের অভাবে এটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথবা এমনও হতে পারে, তাঁর অনেক রচনার মতো এটিও আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু ছাপানো সম্ভব হয়নি। এটা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে তৎকালীন মুসলিম সমাজ তাঁর একটা বড় অবদান থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে স্বগ্রামেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আলাউদ্দীন আহমদ একজন মুসলিম দরদী ঐতিহ্য প্রেমিক গদ্য লেখক ছিলেন। লিখেছেনও তিনি প্রচুর। কিন্তু সে তুলনায় তাঁর বইয়ের সংখ্যা অনেক কম। আর্থিক দীনতাই ছিল এর একমাত্র কারণ। শুধুমাত্র 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকাতেই তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলিই যদি কোন রকমে উদ্ধার করে তা পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তার সংখ্যা অনেক প্রতিষ্ঠিত ও বিশেষ খ্যাত লেখকের রচনার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

এটা খুব বেশি অসম্ভব কার্য নয়। কারণ এককালের বহুল প্রচারিত 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার বহু কপি বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন পাঠাগারে খোঁজ করলে দুষ্প্রাপ্য হবে না। আমাদের সাহিত্য–গবেষকরা তেমন উদ্যোগ নিলে তা আমাদের অনেক কল্যাণে আসবে। কারণ যে প্রয়োজনে আলাউদ্দীন আহমদ এ মূল্যবান নিবন্ধগুলি লিখেছিলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটলেও সে প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নজিবর রহমান

'আনোয়ারা' উপন্যাসের মাধ্যমেই মোহাম্মদ নজিবর রহমান বাঙালি মুসলিম পাঠক সমাজে সমধিক পরিচিত। এমন এক সময় ছিল, যখন এই উপন্যাসখানি ঘরে রাখা বাঙালি মুসলমানদের কাছে কৃষ্টির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হতো।

১৮৫২ সালে পাবনা জেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার) শাহজাদপুর থানার বেলতৈল গ্রামে মোহাম্মদ নজিবর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জয়েনউদ্দীন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের অধিবাসী। পূর্ব পুরুষদের একজন জনাব আলী সরকার মুর্শিদাবাদ থেকে সপরিবারে পাবনার বেলতৈল গ্রামে আগমন করেন।

শাহজাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ছাত্র হিসেবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি লাভ করে তিনি তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দেন। এরপর ঢাকার নর্মাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তাঁর ভিতরকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। এ বয়স থেকেই এদেশের বঞ্চিত-অবহেলিত মুসলমান সমাজের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতে থাকে। ভাগ্যাহত মুসলমানদের পুনর্জাগরণের চেষ্টায় তিনি ব্রতী হয়ে ওঠেন। ছাত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এ সমাজকে বন্ধনমুক্ত করার জন্য একটা গোপন সাধনা তাঁর হৃদয়ে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

ঢাকা নর্মান স্কুল থেকে পাস করার পর দারিদ্র্যহেতু আর পড়াশুনা চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তিনি শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর পরিচয় ঘটে বিশিষ্ট মুসলিম সমাজসেবী ও সমাজ সংস্কারক অনল প্রবাহের কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও মুনশী মেহেরুল্লাহর সাথে। এ দু'জন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম দরদী সাহিত্যিকের কাছ থেকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের প্রেরণা লাভ করেন। অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে উদ্ধারের যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে কৈশোর থেকে জাগ্রত হয়, তারই পথ নির্দেশ তিনি লাভ করলেন এই দুই প্রথিতযশা মুসলিম মনীষীর সংস্পর্শে এসে।

এ দেশের বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের মুক্তির জন্য আরও কয়েকজন বিপ্লবী মুসলিম দরদী মনীষীর সাহচর্য তিনি পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে ঢাকার প্রখ্যাত

www.pathagar.com

নবাব আহসানউল্লাহ, শামসুল হুদা, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী অন্যতম। এসব মনীষীর সাথে তাঁর সাহচর্য লাভের একটা ইতিহাস আছে।

পাবনা জেলার সলংগা নামে একস্থানে এক হিন্দু জমিদার ছিলেন। তিনি ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। এলাকার মুসলমানদেরকে তিনি পশুরও অধম গণ্য করতেন। তাঁর এলাকার মধ্যে মুসলমানদের যে কোনও ধরনের আচার-আচরণ ও ধর্ম-কর্মাদি নিষিদ্ধ ছিল। বিশেষ করে গরু কুরবানী ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

মুসলমান সমাজের প্রতি গোঁড়া হিন্দু জমিদারের এমনতর দুর্ব্যবহার নজিবর রহমানের মনে দারুণভাবে লাগলো। প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো তাঁর মুসলিম দরদী বিপ্লবী মন। শপথ দীপ্ত হলেন তিনি অত্যাচারী হিন্দু জমিদারের কবল থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার জন্য। ইসলাম ধর্ম আর কৃষ্টিকে পুনর্জাগরণের জন্য। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি মমত্ববোধে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শক্তিতে নির্ভরশীলতায় জীবনের সকল ভীতিকে তুচ্ছ করে, জীবনকে সম্পূর্ণ বাজী রেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে। জমিদারের এলাকার মধ্যেই শুধু নয়, তাঁর কাচারির পাশেই নজিবর রহমান নিজে একটা গরু কুরবানী করলেন। সেখানেই ব্যবস্থা করলেন প্রখ্যাত মওলানাদের সমন্বয়ে একটা মিলাদ মাহফিলের। খবর শুনে ফেটে পড়লেন জমিদার মহাশয়। নায়েব পাঠালেন নজিবর রহমানকে ধরে আনতে। নজিবর রহমান সদলবলে তাদেরকে প্রতিহত করলেন। শুরু হলো দু'পক্ষের সংঘর্ষ। ক্ষুদ্র দল নিয়ে তিনি জমিদারের বিরাট বাহিনীর সাথে শক্তিতে পেরে উঠলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন সলংগা থেকে। গোপনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বিভিন্ন স্থানে নতুন শক্তির সন্ধানে। এ সময়েই তাঁর পরিচয় ঘটে প্রাগুক্ত মুসলিম সমাজ সংস্কারকগণের সাথে। তাঁদের প্রেরণা তাঁর অমৃত্যু সাধনা সংগ্রামী জীবনের বিশেষ পাথেয় হয়ে কাজ করে। অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য একদিকে যেমন তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল বিপ্লবী ও বলিষ্ঠতর, অপরদিকে একই উদ্দেশ্যে লুপ্তপ্রায় মুসলিম কৃষ্টির পুনঃ প্রবর্তনের লক্ষ্যে সাহিত্য চর্চাকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তিনি গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে তাঁর লেখা আটখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রকাশিত প্রথম পুস্তকের নাম 'বিলাতী বর্জন রহস্য'। বাংলা ১৩১১ সালে ফরিদপুর থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পুস্তকে লেখক বৃটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদেশীয় অত্যাচারিত বঞ্চিত জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস ছিল। বৃটিশ শাসকের পরিপন্থী হওয়ায় তদানীন্তন সরকার এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

একই বছরে, অর্থাৎ ১৩১১ সালেই 'সাহিত্য প্রসংগ' নামে তাঁর একখানি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে লেখকের সাহিত্য চিন্তামূলক গবেষক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'আনোয়ারা'র (১৯১২) মাধ্যমেই তার সমধিক পরিচিতি। উপন্যাসের মধ্যে লেখক তৎকালীন মুসলিম সমাজ চিত্রকে প্রতিফলিত করেছেন। পবিত্র ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে অবস্থানের মাধ্যমেই যে একটি শান্তিময় পরিবার ও সমাজ এবং সুখী সমৃদ্ধিশালী দাম্পত্য জীবনযাপন সম্ভব, তারই প্রতিফলন দেখানো হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের বৈধ পবিত্র প্রেম আছে, আছে ইসলামকেন্দ্রিক একটি সুখী সমাজের ছবি। তাই উপন্যাসখানি তৎকালে, বিশেষ করে প্রতিটি নব বিবাহিত মুসলিম পরিবারে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। মুসলিম পরিবারের এমন কোন বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল না, যেখানে 'আনোয়ারা' উপন্যাসখানির দু'একটি কপি উপহার হিসেবে পাওয়া না যেতো। সন্ধ্যার সময় উঠোনে গোল হয়ে বসে 'আনোয়ারা' উপন্যাস পড়া হতো। গাঁয়ের অশিক্ষিত মানুষেরা ছুটে আসতো তা শুনতে। কুলবধূরা পর্দার আড়ালে বসে শুনতো। পুস্তকখানি দাম্পত্য জীবনের 'গাইড' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তৎকালীন সামান্য শিক্ষিত মুসলিম সমাজে এমন গৃহ খুব কমই খুঁজে পাওয়া যেতো, যেখানে 'আনোয়ারা'র একটি কপি পাওয়া না যেতো। বস্তুত তৎকালীন মুসলিম সমাজে এমন জনপ্রিয় উপন্যাস দ্বিতীয়টি ছিল না।

'প্রেমের সমাধি' মোহাম্মদ নজিবর রহমানের পরবর্তী উপন্যাস। মানব জীবনের শাশ্বত প্রেমের কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। বিরহ ও মিলনের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত সে প্রেম। প্রেমের সে দু'টি রূপই সমান মূল্যবান। অবশ্য সে প্রেম শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীরই নয়, সংসারের সর্বক্ষেত্রের। সংসারের সকল সদস্যের মধ্যে প্রেম বা আন্তরিক বন্ধনের মাধ্যমেই সুখী সংসার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই শিক্ষাই এ উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের মূল শিক্ষা শান্তির কথাই এতে বলা হয়েছে।

'পরিণাম' উপস্যাসে একটা পবিত্র সংসার গঠনের ইংগিতই দেওয়া হয়েছে। অসৎ কর্ম অসৎ জীবনের উৎস, এতে করে একটা গোটা সমাজ কলুষিত হয়ে যায়। অসৎ কর্ম সম্পাদনকারীর পরিণতিও ভয়ংকর। এগুলিই হচ্ছে 'পরিণাম' উপন্যাসের মূল বক্তব্য।

'গরীবের মেয়ে' একখানি সামাজিক উপন্যাস। এতে একটি অতি সাধারণ পরিবারের চিত্র অংকিত হয়েছে। সুখী-সমৃদ্ধিশালী সংসার গঠনের জন্য অর্থ বৈভব যে কোনো প্রয়োজনীয় উপকরণ নয়; বরং এজন্য সৎ প্রচেষ্টা আর স্বচ্ছ মনটাই আসল সম্বল, 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসে লেখক তা-ই দেখিয়েছেন।

'হাসান গঙ্গা বাহমনী' উপন্যাসের মূল বক্তব্যও অনেকটা একইরকম। এটিও একখানি সামাজিক উপন্যাস। সুষ্ঠু সমাজ গঠনে লেখকের স্বচ্ছন্দ প্রয়াস এ উপন্যাসের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

'দুনিয়া আর চাই না' নজিবর রহমানের লেখা সর্বশেষ উপন্যাস। পুস্তকখানিতে মুসলিম সতী নারীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এ পুস্তকখানিও মুসলিম রমণীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ।

১৯২৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে মোহাম্মদ নজিবর রহমান ইন্তিকাল করেন।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান ছিলেন মুসলিম বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রতিভা। এ দেশের অধঃপতিত মুসলিম পুনর্জাগরণের ব্রত নিয়েই তিনি কলম ধরেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য চর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলিম সমাজের সেবা। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মুসলমানদের হারানো কৃষ্টি আর সভ্যতার সাথে নতুন করে তিনি পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায় একই সমাজের প্রতিচ্ছবি। সে সমাজ পবিত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত শান্তিময় সমাজ। আপন পান্ডিত্য প্রকাশের চেয়ে সমাজের স্বল্পশিক্ষিত মানুষকে জানাবার প্রবণতাই ছিল তাঁর সাধনা।তাই তাঁর প্রতিটি পুস্তকের ভাষা অত্যন্ত সরল, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদেশীয় সাধারণ মুসলমান সমাজ যখন তাদের আপন ধর্মীয় কৃষ্টি ও জীবন ব্যবস্থা থেকে বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে চলে গিয়ে দিনের পর দিন অবক্ষয়ের পথে চলে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের সাহিত্যকর্ম বাঙালি মুসলিম সমাজকে এক পবিত্র সত্য পথে জীবন বিধানের ইংগিত প্রদান করেছিল। তাই বাঙালি মুসলিম সমাজে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের অবদান অবিস্মরণীয়।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ দাদ আলী

ইংরাজী ১৮৫২ সালে কুষ্টিয়া জেলার আটিগ্রামে কবি মোহাম্মদ দাদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ নাদ আলী। মাতার নাম সৈয়দা সাজেদুন্নেছা। অল্প বয়সে তিনি পিতৃহারা হলেও বিদ্যানুরাগিণী মাতা তাঁকে সুশিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা করেন। মাতার প্রচেষ্টাতেই অল্প বয়সে তিনি বাংলা ছাড়াও আরবী, ফাসী ও সংস্কৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর দখল ছিল। জানা যায়, জীবিকার্জনের জন্য চিকিৎসা ব্যবসাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

সমকালীন বিপর্যস্ত ও অধঃপতিত মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ও সহানুভূতি ছিল। তাই স্বীয় গ্রাম আটিগ্রামে মুসলমান ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তিনি একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা, মুসলিম অধ্যাত্ম চিত্ত বিকাশের প্রয়োজনে একটি মসজিদ স্থাপন ও বিশেষ করে মুসলিম জনগণের সেবার্থে একটি পুষ্করিণী খনন করেন। বিভিন্ন স্থানে ধর্মসভা করে ইসলামের শান্তিময় বাণী প্রচার করতে থাকেন। এ ব্যাপারে তৎকালীন অন্যতম খ্যাতিমান মনীষীদ্বয় মুনশী মেহেরুল্লাহ ও মুনশী জমিরুদ্দীনের সাহচর্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি তিনি লাভ করেন।

১৮৭৮ সালে ১৬ বছর বয়সে যশোর জেলার ভাটনা রহিমপুর গ্রামের মফিউন্নেছার সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত মধুর হয়। সুদীর্ঘ ৩৫ বছর সুখী দাম্পত্য জীবনের পর ১৯০৩ সালে তাঁর স্ত্রী মারা যান। স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথায় তিনি অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই শোক থেকেই জন্মলাভ করে তাঁর সাহিত্য-জীবন। স্ত্রী-বিরহের শোকগাঁথা নিয়ে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙ্গাপ্রাণ ঃ প্রথম খণ্ড'। মোট সতেরটি কবিতা নিয়ে এটি রচিত। এর মধ্যে চৌদ্দটিই মৃত স্ত্রীকে স্মরণ করে রচিত। বাকি তিনটি সমাজ সচেতনাত্মক। আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু গ্রন্থখানি মুদ্রণের জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। শেষ পর্যন্ত পাবনা জেলার তৎকালীন

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেট এস. সি. মুখার্জী ও নবাব শামসুল হুদা সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতাতে গ্রন্থখানি মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছিল।

এর দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আশেকে রসূল'। দু'খন্ডে এটি সমাপ্ত। প্রথম খন্ডে ছিল ৩৬টি কবিতা। দ্বিতীয় খন্ডে ১৩টি। কবিতাগুলি ছিল 'নাতিয়া' শ্রেণীভুক্ত। প্রতিটি কবিতাতে রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি কবির অসীম এ অকৃত্রিম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ পরিস্ফুটিত হয়েছে। কবিতাগুলি কিছুটা বাউল প্রভাবিত এবং গজল জাতীয়ও বটে। প্রতিটি কবিতা পাঠে যে কোনও মুসলমানের হৃদয়ে নবীপ্রেম জাগরিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই এ কাব্যগ্রন্থখানি (উভয় খণ্ড) এক সময় এদেশীয় মুসলিম সমাজের কাছে ধর্মগ্রন্থের মত সমাদৃত হয়েছিল।

১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সমাজ শিক্ষা'। সর্বমোট ১৪৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে ১৯টি কবিতা আছে। পদ্য ছন্দে এগুলি রচিত। তৎকালীন মুসলিম সমাজের অবনতি দেখে কবি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই এই সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন নৈতিক উপদেশ দিয়ে তিনি কবিতাগুলি রচনা করেন। এমনি ধরনের উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে কবি মুসলমানদের গৌরবময় কাহিনী এবং বর্তমান অধঃপতনের চিত্র বর্ণনা করেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। পুস্তকখানি তদানীন্তন অন্যতম খ্যাতিমান সমাজ দরদী ও সমাজ সংস্কারক নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নামে তিনি উৎসর্গ করেন।

তাঁর লেখা চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'শান্তিকুঞ্জ' প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৬। মনে হয় এটিই কবির সর্ববৃহৎ কলেবরের গ্রন্থ। মোট ২২টি কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলি দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত ঐশী প্রেম। দ্বিতীয়ত প্রকৃতি বিষয়ক। তবে প্রথমোক্তটিরই প্রভাব বেশি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের এ শ্রেণীর কবিতাগুলি পাঠক, বিশেষ করে মুসলিম পাঠক চিত্তকে বিশেষভাবে ধ্যানমগ্ন করে তোলে। গ্রন্থখানি আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তা হচ্ছে, কবির ছন্দ প্রয়োগ রীতি। ছন্দ প্রয়োগে কবি যে একজন সুদক্ষ কারিগর ছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থখানি তারই বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। সাহিত্যের পরিণত কর্মী হিসেবে রচিত বলেই কি এটা সম্ভব হয়েছে? হতেও পারে।

'আখেরে মওত বা অন্তিম মৃত্যু' তাঁর আর একখানি কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু এর প্রকাশকাল জানা যায় না। গ্রন্থখানি পাঠে মানব জীবন পরিসমাপ্তি, তথা মৃত্যুর কথা স্মরণ করে চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। গ্রন্থখানিতে কবি মানবজীবনের পরিসমাপ্তির করুণ দৃশ্য অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে পরিস্ফুট করেছেন। যে কোনো পাঠকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। মানব-চিত্ত ইহজীবনের কোন্দল, হিংসা-দ্বেষ ভুলে মহাযাত্রার চিন্তায়

www.pathagar.com

দিশেহারা হয়ে পড়ে। পথহারা ভ্রান্ত মুসলিম সমাজের জন্য এটি তাই একটি পথপ্রদর্শকও বটে।

'ফারায়েজ' নামে তাঁর লেখা আর একখানি গ্রন্থের কথা জানা যায়। কিন্তু এইটুকু ছাড়া গ্রন্থখানি সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

'শান্তিকুঞ্জ' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁর লেখা প্রকাশিত পুস্তকের তালিকায় ১৫ খানি পুস্তকের নাম দেখা যায়। এর মধ্যে একখানি আয়ুর্বেদীয় এবং একখানি এ্যালোপেথিক চিকিৎসা বিষয়ক। দু'টিই ছন্দবদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

তাঁর লেখা বেশ কিছু অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে 'দেওয়ালে দাদ,' 'ভাঙ্গাপ্রাণ দ্বিতীয় খণ্ড,' 'উপদেশমালা,' 'সঙ্গীত প্রসূন' ইত্যাদি। এর মধ্যে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থখানি ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিরহমূলক।

আর্থিক দিক দিয়ে কবি মোহাম্মদ দাদ আলী খুব বেশি অসচ্ছল ছিলেন। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই অন্যের আর্থিক সাহায্যে প্রকাশিত হয়। আর এই আর্থিক অসচ্ছলতাহেতুই শেষোক্ত গ্রন্থগুলি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে বলে মনে হয়। অবশ্য এগুলি প্রকাশিত হলে তাঁর কাছ থেকে এদেশীয় মুসলিম সমাজ আরও বেশি উপকৃত হতো। তবুও সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজকে যা দিয়ে গেছেন, তার মূল্য কম নয়। কারণ তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ তৎকালীন এদেশীয় মুসলিম সমাজ পুনর্জাগরণে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল।

১৯৩৬ সালে ৮৪ বছরের পরিণত বয়সেই কবি মোহাম্মদ দাদ আলী ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

রেয়াজ আল-দীন আহমদ মাশহাদী

১৮৫৮ সালে বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত চারান গ্রামে রেয়াজ আল্-দীন আহমদ মাশহাদীর জন্ম। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কোলকাতার আলীয়া মাদ্রাসাতেই তাঁর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয়। ইরানের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা জামালউদ্দীন আফগানীর নিকট থেকে তিনি বায়াত গ্রহণ করেন।

আরবী ছাড়াও বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী ও উর্দু ভাষাতেও তাঁর দখল কম ছিল না। আলীয়া মাদ্রাসাতে তিনি দীর্ঘদিন যাবত বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা ভাষাতে তাঁর গভীর অনুরাগ ও পাণ্ডিত্য ছিল। তাই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তিনি হতাশাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমানদের পুনর্জাগরণের ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত বেশ কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়।

'সমাজ ও সংস্কারক' তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এটি প্রথমে কোলকাতার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৯৬ সালে। এটি তাঁর দীক্ষাগুরু সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর কর্ম জীবনের বিবরণী। এদেশের হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রেরণা দানের জন্য উক্ত মহামনীষী ইংরাজী ১৮৫৭, ১৮৬১ এবং ১৮৮২ সালে এদেশে আগমন করেন। উক্ত সময় বিভিন্ন বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে তিনি এদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। যার ফলে ক্ষমতাসীন ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে বিরত থাকতে বাধ্য করে। এসব ঘটনাই হচ্ছে 'সমাজ ও সংস্কারক' পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। পুস্তকে এসব ঘটনার আলোকপাত করতে গিয়ে লেখক প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিরও বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ, মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকের অত্যাচার, হিন্দুদের বৈরিতা প্রভৃতি অন্যতম। উদাত্ত চিত্তে ডাক দিয়েছেন তিনি মুসলমানদের বলদীপ্ত প্রত্যয় সৃজনের জন্য। পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সুষ্ঠু আদান-প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় জ্ঞানকে পূর্ণ করতে।

www.pathagar.com

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করে।

এ বছরেই, অর্থাৎ বাংলা ১২৯৬ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক 'অগ্নি কুক্কুট'। এটি এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১২৯৫ সালে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের 'গো জীবনী' পুস্তকের প্রতিবাদ হিসেবে রচিত। মুসলমান কর্তৃক গো-হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে হিন্দুরা এক প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। তখন মীর মশাররফ হোসেন হিন্দুদের সাথে সমঝোতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি মনে করলেন, হিন্দুদের সাথে সদ্ভাবের অভাব এদেশের মুসলমানদের শান্তি বিপন্ন করবে। সেই দৃষ্টি ও মনোভঙ্গি নিয়ে তিনি রচনা করেন 'গো জীবনী' পুস্তকখানি। মীর সাহেবের এ মনোভাব ও প্রচেষ্টা মাশহাদী সাহেবকে গভীরভাবে মর্মাহত করলো। তারই প্রতিবাদে তিনি রচনা করলেন 'অগ্নি কুক্কুট' পুস্তকখানি। পুস্তকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে তিনি এটাই প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন যে, হিন্দুদের সাথে কোনরকম আত্মসমর্পণমূলক সমঝোতা নয়; বরং নিজেদের স্বাধীনচেতামূলক আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠিতি সম্ভব। এটি তাঁর একটি জ্বালাময়ী রচনা। পুস্তকের নামকরণেই (অগ্নি কুক্কুট বা আগুনের কুণ্ড) তার ছাপ রয়েছে। হিন্দু কর্তৃক মুসলমানদের প্রতি অবিমৃষ্যকারী ব্যবহার ও নানাবিধ অত্যাচারের জন্য ইংরেজ সরকারকে দায়ী করে আলোচ্য পুস্তকে তিনি বলেছেন-'ভারতবর্ষীয় ইংরেজ গভর্নমেন্ট! তুমি কি অন্ধ? হিন্দু কর্তৃক মোসলমানদের প্রতি এই যে দেশব্যাপী অসহ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে মোসলমানদের কিছু বলিবার পূর্বেই কি তোমার সে উৎপীড়ন চেষ্টার মূলোচ্ছেদ করা উচিৎ নহে?' 'সমাজ ও সংস্কারক' পুস্তকের ন্যায় এটিও ইংরেজ শাসকের রোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়।

'প্রবন্ধ কৌমুদী' তাঁর তৃতীয় রচনা। ইংরাজী ১৮৯১ সালে এটি প্রকাশিত হয়। আইয়্যামে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগে আরবের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পয়দায়েশ এবং ধর্ম প্রচারের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ 'আরব ও এছলাম'। মোছলেম বীরাঙ্গনা খাওয়ালার বীরত্বময় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'মোছলমান বীরাঙ্গনা' প্রবন্ধে। রহিম খাঁ ও শোভা সিংহের বিদ্রোহ এবং বর্ধমানের মুসলিম সেনানায়ক নেয়ামত খাঁ ও রাজকন্যার বীরত্বপূর্ণ মুসলিম গৌরব ও ঐতিহ্যময় কাহিনীই হচ্ছে তৃতীয় প্রবন্ধ 'আত্মসম্মান ও প্রকৃত বীরত্ব'-এর প্রতিপাদ্য বিষয়। 'এরমুখ যুদ্ধের পূর্বাভাস' প্রবন্ধে সিরিয়ায় মুসলিম

www.pathagar.com

বিজয়ের গৌরব কাহিনীকে তিনি বর্ণনা করেছেন তেজোদীপ্ত ভাষায় এবং বলদৃপ্ত প্রত্যয়ে। এদেশে মুসলমানরা যখন নামেমাত্র অস্তিত্বে জীবনপাত করছিল, এমনকি তাদের সামান্যতম অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই সুযোগে হিন্দু নরপতিরা এদেশীয় মুসলমানদের শেষ চিহ্নটুকুকে বিলীন করে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলমানদের উদ্ধারকারী হিসেবে এদেশে আগমন করেন প্রখ্যাত তুর্কী মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী। তাঁরই বীরত্বময় শক্তি, মেধা ও প্রজ্ঞায় এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নব-জীবন। পত্তন হয় এক শক্তিময় নতুন মুসলিম সাম্রাজ্য। এই গৌরবময় কাহিনী নিয়ে রচিত 'প্রবন্ধ কৌমুদী' পুস্তকের পঞ্চম প্রবন্ধ 'মালেক আল্ গাজী'। আলোচ্য পুস্তকের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'মহরম'। মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক বিশেষভাবে মহরম অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন এবং তার ত্রুটিপূর্ণ দিক সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি এ প্রবন্ধে। প্রসঙ্গত দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন-'এখন আর ইহাতে শোকের ভাগ নাই। কালক্রমে ইহা এক নরপূজারূপে পরিণত হইয়া ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ পথে যাইয়া পড়িয়াছে। শোক ঘটনার এইরূপ পুনরাভিনয় করা হাদীস শরীফ অনুসারেও নিষিদ্ধ।

ইংরাজী ১৮৯৫ সালে 'সুরিয়া বিজয়' নামে তাঁর লেখা আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পূর্ব প্রকাশিত পুস্তক 'আরব ও এসলাম'-এর কাহিনীর যেখানে সমাপ্তি; অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (সা)-এর ইনতিকালের পর থেকে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালীন ঘটনা নিয়ে পুস্তকখানি রচিত। পরবর্তী খলীফাগণের গৌরবময় কীর্তি কাহিনী নিয়ে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর ছিল বলে পুস্তকের ভূমিকাতে লেখক উল্লেখ করলেও সে ইচ্ছা কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য যে, 'সুরিয়া বিজয়' গৌরব গাথাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের বছর তিনেক পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯২ সালে এটি শেখ আব্দুর রহীম সম্পাদিত 'মিহির' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বের মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যময় কাহিনী নিয়ে একখানি বিশাল গ্রন্থ রচনার সদিচ্ছাযুক্ত পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কিন্তু তা সমাপ্তির আগেই ১৯১৯ সালে ৬১ বছর বয়সে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নেয়।

রেয়াজ আল্-দীন আহমদ মাশহাদীর সাহিত্যের ভাষা ছিল খাঁটি বিশুদ্ধ ও গুরু গম্ভীর। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেয়ে উদ্দেশ্যময়ী বক্তব্য প্রকাশই ছিল তাঁর সাহিত্য সেবার মূল লক্ষ্য। মুসলমানদের ঐতিহ্য চেতনা নিয়েই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না, মুসলমানদের বর্তমান সামাজিক জীবনে সেই হৃত ঐতিহ্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে তিনি কলম

www.pathagar.com

ধরেছিলেন। সংগ্রাম করেছিলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে মুসলিম জাগরণে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ' বলে উল্লেখ করেছেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁকে বলেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের একজন খ্যাতনামা চিন্তানায়ক।' আর ডক্টর আনিসুজ্জামানের ভাষায়, 'তিনি শুধুমাত্র মুসলমানের নয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পদেরও উত্তরাধিকারের দাবীদার।' তাঁর মতে 'স্মৃতির চেয়ে কর্মকেই তিনি গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন'।

তাঁর প্রকৃত নাম নিয়ে পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ধারণা, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী'। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেবও উক্ত ধারণায় বিশ্বাসী। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর আনিসুজ্জামানের মতে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'রেয়াজ আল-দীন আহমদ মাশহাদী'। তিনি নিজে এভাবেই নিজ নাম লিখতেন বলে প্রমাণ আছে। সুতরাং এটাই তাঁর প্রকৃত নাম বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্

ইংরাজী ১৮৬৩ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ শহরের সন্নিকটে হোসেনপুর গ্রামে মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর জন্ম হয়। তিনি যশোরের প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর সমসাময়িক ছিলেন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর মতই তাঁর কাব্যাদর্শ ছিল ইসলাম প্রচারমূলক। এজন্য উভয়ের পরিচিতির মধ্যে বেশ কিছুটা তালগোল পাকিয়ে আছে। উভয়ের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে একজনের লেখা গ্রন্থকে অন্যজনের বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার মেহেরুল্লাহ বলতে একমাত্র মুন্‌শী মেহেরুল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর প্রভায় মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর পরিচিতি প্রায় চাপা পড়ে গেছে। বিস্মৃত হয়েছেন তিনি অনেকের দৃষ্টি থেকে। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর মত লেখাপড়ায় সুশিক্ষিত না হলেও তাঁর আহরিত জ্ঞান ও সাহিত্য প্রতিভা কম ছিল না। পারিবারিক অসচ্ছলতার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিক লেখাপড়া তিনি শিখতে পারেন নি। কিন্তু নিজস্ব প্রচেষ্টায় আরবী ও ফার্সী ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভে সক্ষম হন। বিভিন্ন ধরনের পুস্তক পাঠে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। সে জন্য কঠোর দারিদ্রের মধ্যেও নিজস্ব সংগ্রহে তিনি একটা পারিবারিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নিজে উচ্চ শিক্ষিত না হলেও শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ আর উৎসাহ। তাই দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি অনেকগুলি স্কুল ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। আপন গৃহ সংলগ্নে স্থাপন করেন একটি মধ্য বাংলা বালিকা বিদ্যালয়।

জ্ঞানী–গুণীজনের সাহচর্যে নিজকে তিনি ধন্য মনে করতেন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ এবং বিখ্যাত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের লেখক মওলবী নজিবর রহমানের সাথে ছিল তাঁর সুহৃদ সম্পর্ক।

তিনি একজন প্রত্যক্ষ সমাজ সেবকও ছিলেন বটে। সেজন্য দীর্ঘদিন তিনি পাবনা জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর সাথে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা প্রদান করে তাঁর বাগ্মিতাগুণের পরিচয় প্রদানে তিনি সক্ষম হন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। ইসলাম প্রচারণাই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন সাহিত্যের মাধ্যমে এদেশীয় অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণ ঘটাতে। আপন কৃতিত্বে প্রতিষ্ঠিতি নয়, বরং উপরিউক্ত উদ্দেশ্যকে সম্বল করে পূত হৃদয়ে তিনি আত্মনিবেদিত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের আসরে।

তাঁর রচিত সর্বমোট ১০ খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র দু'খানি ছাড়া আর কোনটির রচনাকাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

'বাঙ্গালা কোরআন শরীফ ঃ প্রথম খণ্ড' তাঁর প্রথম রচনা বলে অনুমিত হয়। এটি পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা সহজ, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। অনুবাদ কর্মে আপন পাণ্ডিত্য প্রদর্শন নয়, পবিত্র কুরআন শরীফের মূল বক্তব্যকে সাধারণ মুসলমান পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। অবশ্য তাতে করে মূল অর্থ যাতে সামান্যতম বিকৃত অথবা ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখেছেন। আরবী ভাষা আমাদের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্রতম ভাষা হিসেবে গণ্য হলেও মাতৃভাষাতে ছাড়া পবিত্র কুরআন শিক্ষা গ্রহণ তাঁদের কাছে কষ্টকর—এ সত্যটাকে মর্মোপলব্ধি করেই তিনি আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। অনূদিত পবিত্র এ গ্রন্থখানির ভূমিকা পাঠে মনে হয় সমগ্র কুরআন শরীফের অনুবাদ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কেন যে সেটা হয়নি, সে সম্পর্কে তথ্যনির্ভর কিছু জানা যায় না।

'মানব জীবনের কর্তব্য' তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থ। সমাজে, তথা বিশ্বে আদর্শ মানবরূপে বেঁচে থাকতে হলে, জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলতে হলে কি কি প্রয়োজন–এ গ্রন্থটি হচ্ছে তারই সুনির্দেশিকা। পবিত্র কুরআন আর হাদীসের আলোকে এটি তিনি রচনা করেন। বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম মনীষীদের জীবনযাত্রাকেও তিনি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন।

অধঃপতিত মুসলিম সমাজের দুর্দশাময় অবস্থা দর্শনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিম সমাজের মধ্যে অনাচার, কুসংস্কার ইত্যাদি দুষ্ট ব্যাধিই তাদের এ অধঃপতনের কারণ। তাই এ পঙ্গু সমাজের নব সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করলেন। তারই তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ পথের নির্দেশ দিয়েই তিনি রচনা করেন 'এসলাহল কওম বা সমাজ সংস্কার' গ্রন্থখানি।

www.pathagar.com

তাঁর 'সমাজ চিত্র' গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুও অনেকটা অনুরূপ। এ গ্রন্থে অধঃপতিত মুসলমানদের করুণ সামাজিক চিত্রকে তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে অংকন করেছেন তাঁর নিখুঁত ভাষার তুলিতে। অধঃপতিত মুসলমান সমাজের দুর্দশাময় চিত্র দেখে তিনি দুঃখিত ও শংকিত হয়েছেন। অনুমিত হয়, এ গ্রন্থখানি তাঁর 'এসলাহল কওম বা সমাজ সংস্কার'-এর পূর্বের রচনা। কারণ, এ গ্রন্থে অভিশপ্ত সমাজের যে চিত্র তিনি অংকন করে দুঃখক্রান্ত হয়েছেন, 'এসলাহল কওম বা সমাজ সংস্কার' গ্রন্থে সেই চিত্র থেকে মুক্তির পথই তিনি প্রদর্শন করেছেন।

'মহাবাক্যাবলী' তাঁর লেখা একটি নীতিবাক্যপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ। জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও মার্জিতভাবে গড়ে তুলতে হলে যেসব গুণের প্রয়োজন, ছোট ছোট নীতিকথার পুষ্প দিয়ে একটি সুন্দর মালা গেঁথে গ্রন্থখানি তিনি সাজিয়েছেন। কুরআন, হাদীস, বিভিন্ন মনীষীদের উক্তি, প্রচলিত প্রবচন ইত্যাদি থেকে এসব নীতিকথার পুষ্প সংগৃহীত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি যে কোন ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর, সামগ্রিক জীবন গঠনে মূল্যবান প্রয়োজনীয় সম্পদ।

ইসলাম একটি পরম সত্য ও শান্তির ধর্ম। একথা শুধুমাত্র ইসলামই স্বীকার করে না, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে তার উজ্জ্বল স্বীকৃতি। বেদ, বাইবেল, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ পরম সত্যের শক্তিধর প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন তিনি তাঁর 'শ্লোকমালা' গ্রন্থে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাঁরা গোঁড়ামি করে ইসলাম ধর্মকে তুচ্ছ মনে করতেন, আল্যেচ্য গ্রন্থে লেখক তাদেরই 'শিলনোড়া' দিয়ে তাদেরই 'দাঁতের গোড়া' ভেঙেছেন। এ গ্রন্থে লেখকের শক্তিশালী দুঃসাহসী মনের ছাপ সুস্পষ্ট।

বাল্য বিবাহ এক সময় এদেশীয় মুসলমান সমাজকে চরম দুর্দশা আর দুর্ভোগের পথে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। এ প্রথার ফলে মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছিল দুঃখময় পরিণতি। তাই বাল্য বিবাহের কুফল বর্ণনা এবং এ থেকে মুক্ত হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি রচনা করেন 'বাল্য বিবাহের বিষময় ফল' গ্রন্থখানি। তাঁর এ আহবান একেবারে ব্যর্থ হয়নি। গ্রন্থখানি পাঠ করে ভুক্তভোগীরা তো বটেই, অনেকেই বাল্য বিবাহের কুফল মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ গ্রন্থখানি রচনার ফলে তৎকালীন সমাজ থেকে বাল্য বিবাহ অনেকখানি হ্রাস পেয়ে যায়। এতে সমাজ অনেকখানি উপকৃত হয়। তৎকালীন 'বাসনা' পত্রিকা গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

'হক নসীয়ত'-এর বিষয়বস্তু অনেকটা 'মহাবাক্যাবলী'রই অনুরূপ। তবে 'মহাবাক্যাবলী'তে বিভিন্ন সূত্র হতে নীতিকথাসমূহ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু 'হক নসীয়ত'-এ নীতিকথার অধিকাংশই পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত 'ইসলামী বক্তৃতামালা'। গ্রন্থখানি সম্পর্কে তৎকালীন 'বাসনা' পত্রিকার উক্তি—'সহজ সরল সুন্দর ভাষায় সুন্দর উপদেশ। যাহারা নতুন নতুন বক্তৃতা করার অভ্যাস করিতেছেন, এ পুস্তক তাহাদের বড় কাজে লাগিবে। স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে ধর্মাভাব ও সুচিন্তার বীজ বপনের জন্য এই প্রকার পুস্তক উপকারী। মেয়েদের হাতে দিলেও অনেক ফল লাভ হইবে। এ পুস্তকের প্রচার বাঞ্ছনীয়।'

ধর্মীয় বিভিন্ন উপদেশ সমন্বয়ে রচিত গ্রন্থ 'উপদেশমালা'। এর বিষয়বস্তু অনেকটা 'হক নসীয়ত'–এর মতই। এটি তৎকালীন মুসলিম সমাজের নিত্য পাথেয় হিসেবে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। মোট ২৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ।

আগেই বলা হয়েছে, অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণই ছিল মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সাহিত্য সাধনার মূল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, তাঁর এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে তৎকালীন দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। তৎকালীন মুসলমানগণ এসব গ্রন্থ থেকে তাদের নিত্য দিনকার চলার পথের পাথেয় নতুন জীবন গঠনের প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। তাই এদেশীয় মুসলিম সমাজ তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৫১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন

১৮৭০ সালে তৎকালীন নদীয়া জেলার গাড়াডোব বাহাদুরপুর গ্রামে শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীনের জন্ম। অতি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালাতে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তারপর মক্তবে। এরপর কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি খৃষ্টান মিশনারীদের খপ্পরে পড়েন। মিশনারীদের প্রচারণায় খৃষ্টধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৮৭ সালে ১৭ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে জন জমিরুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম শিক্ষায় নিবিষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮৯২ সালে কোলকাতার সি. এম. এস. ক্যাথিড্রেল মিশন ডিভিলিটি কলেজ থেকে খৃষ্ট ধর্মতত্ত্বে বিশেষ জ্ঞানসহ মিশনারী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। এরপর খৃষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু বেশি দিন তিনি এ প্রচারণার কাজে থাকতে পারলেন না। ক্রমে ক্রমে খৃষ্ট-ধর্মের অসারতা এবং ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য তাঁর কাছে প্রমাণিত হতে থাকলো। ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করার জন্য এই ধর্ম সম্পর্কে যত বেশি তিনি অধ্যয়ন করতে লাগলেন, এ ধর্মের গুণাগুণ ও মাহাত্ম্য তাঁকে আরও বেশিভাবে আকৃষ্ট করতে থাকে। অপরদিকে খৃষ্টধর্মের ত্রুটিসমূহ তাঁর কাছে বেশি করে প্রতিভাত হতে লাগলো। খৃষ্টান পাদ্রীদের অশুভ চক্রান্ত তাঁর কাছে উন্মোচিত হতে শুরু করলো। নিজের ভুল তিনি বুঝতে পারলেন। অনুশোচনা তাঁকে দগ্ধ করতে লাগলো। তাই ১৮৯৫ সালে তিনি আবার ফিরে এলেন স্বধর্মে।

এতদিন স্বধর্ম থেকে দূরে থাকার জন্য একটা অপরাধবোধ সৃষ্টি হয় তাঁর নিজের মধ্যে। তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাই নিজেকে সার্বিকভাবে নিয়োগ করলেন পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে। তার সাথে খৃষ্ট-ধর্মের অসারতা প্রমাণ করার জন্য হলেন তৎপর। এর জন্য তিনি বেছে নিলেন দু'টি পথ। প্রথমত বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচারমূলক জনসভা। দ্বিতীয়ত লেখনীর মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন।

এ সম্পর্কিত তাঁর প্রথম পুস্তক হচ্ছে, 'ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য'। এটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩০৭ সাল মুতাবিক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। এতে

www.pathagar.com

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের দশজন মনীষী ইসলাম ধর্মের যথার্থতা সম্পর্কিত বক্তব্য সংকলিত হয়। এসব মনীষী হচ্ছেন–পণ্ডিত ধনানন্দ মহাভারতী, টমাস কার্লাইল, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, ম্যাক্সমূলার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, গিরীশ চন্দ্র সেন, মহেন্দ্র নাথ বসু, গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী, চন্দ্র শেখর সেন ও টি. ডব্লিউ আর্নল্ড।

১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'শোকানল' পুস্তকখানি। তাঁর পাঁচজন একান্ত আপনজনের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে তিনি পাঁচটি কবিতা রচনা করেন। তারই সংকলন এ পুস্তকখানি। এসব আপনজনের মধ্যে তাঁর প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী অন্যতম। এ দু'জনকে হারানোর ব্যথাই তাঁকে বেশি করে উদ্বুদ্ধ করেছিল পুস্তকখানি রচনায়।

'ইসলামী বক্তৃতা' তাঁর রচিত তৃতীয় পুস্তক। এটি 'ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড ইসলাম' নামক একখানি ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ। প্রকাশকাল ১৯০৭ সাল।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন' তাঁর রচিত চতুর্থ পুস্তক। এতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর জীবনী ও জীবন দর্শন এবং ইসলাম ধর্ম বিনষ্টে পাদ্রীদের অশুভ তৎপরতার বিবরণ দিয়েছেন তিনি বিশদভাবে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করেছেন অনেক অকাট্য যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে। মোহাম্মদ মুনসুরউদ্দীন সাহেব এটিকেই শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীনের শ্রেষ্ঠতম রচনা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ত্রিপুরার পাদ্রী জন টেকেল রচিত 'শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুনশীর ভুল' পুস্তকের প্রতিবাদে তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। নিজের লেখা ১২টি ইসলামী গজল, মীর মশাররফ হোসেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি করে কবিতা এবং মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর লেখা ২টি গজলের সংকলনে 'আসল বাংলা গজল' নামে তাঁর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে।

যশোরের প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ ছিলেন তাঁর সহকর্মী ও একান্ত আপনজন। দু'জন গলায় গলায় মিলিত হয়ে এ দেশে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ১৯০৭ সালে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর মৃত্যু হয়। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর জীবনাদর্শ, কর্মধারা এবং তাঁদের উভয়ের যৌথ কর্ম বিবরণী দিয়ে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'মেহের চরিত' পুস্তকখানি।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য' পুস্তকখানি। এতে খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলে বিশ্বনবী (সা)–র আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী ও বিশিষ্ট পাদ্রী রাউস রচিত বিশ্বনবীর আবির্ভাব সম্পর্কিত বাইবেলে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক রচনার অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বনবী (সা)–র শ্রেষ্ঠত্বকে তিনি প্রমাণ করেছেন।

www.pathagar.com

১৮৯৯ সালে নদীয়ার ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রীদের কর্তৃক 'সত্যধর্ম নিরূপণ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বিকৃতভাবে চিহ্নিত করা হয়। পবিত্র কুরআনকে আখ্যায়িত করা হয় একটি অসার গ্রন্থ বলে। পুস্তকখানি পাঠ করে শেখ জমিরউদ্দীন গভীরভাবে ব্যথিত হন। তাই উক্ত পুস্তকের প্রতিবাদে ১৯২৫ সালে 'রদ্দে সত্য ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান' পুস্তকখানি তিনি রচনা করেন। এতে লেখক প্রচুর যুক্তি দিয়ে পাদ্রীদের মতবাদের অসারতা প্রমাণে সফল হন।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'হযরত ঈশা কে?' পুস্তকখানি। এটিও পাদ্রীদের মতবাদের বিরুদ্ধে রচিত। হযরত ঈসা বা যীশু খৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের পুত্রও নন। আমাদেরই মত ঈশ্বরের বান্দা মাত্র—এ কথাই বুঝিয়েছেন আলোচ্য পুস্তকে। আকবর মসীহ রচিত 'উলুহতে মসীহ' নামক উর্দু গ্রন্থের অবলম্বনে এটি তিনি রচনা করেন।

খৃষ্টান পাদ্রী মনরো 'মুসলমান মওলবীগণের শিক্ষা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। এতে মুহাম্মদ (সা)-কে কলংকিত ও পাপী বলে বর্ণনা করা হয়। (নাউজুবিল্লাহ) এর প্রতিবাদে শেখ জমিরউদ্দীন ১৯২৭ সালে লিখলেন 'পাদ্রী মনরো সাহেবের ধোঁকা ভঞ্জন' পুস্তকখানি। এতে তিনি পাদ্রী সাহেবের উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হলেন যে, যীশু খৃষ্ট নিষ্পাপ ছিলেন না। বাইবেল থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখালেন যে, যীশু খৃষ্ট স্বীয় অপরাধের জন্য নিজেই ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিষ্পাপ প্রমাণিত করে 'মাসুম হযরত মোহাম্মদ' নামে আর একখানি পুস্তক তিনি রচনা করেন একই সময়ে। এ পুস্তকখানিতেও লেখকের বিশেষ যুক্তিবাদী মনের ছাপ সুস্পষ্ট।

তৎকালীন এ দেশের, বিশেষ করে স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমানগণ অমুসলিম কৃষ্টি ও ভাবধারাতে পরিচালিত হচ্ছিলেন। নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার ছিল তাঁদের সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। ভাষাতেও, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রে হিন্দুয়ানী রীতি প্রচলিত ছিল। এসব পথভ্রান্ত মুসলমানকে ইসলামী পথে পরিচালিত করার জন্য তিনি লেখেন 'বিশুদ্ধ খতনামা'। এ পুস্তকখানিতে তিনি মুসলমানদের ইসলামী পন্থায় পত্র লেখার পদ্ধতি নির্দেশ করেন। যেমন, পুস্তকের 'উপদেশ' অংশে তিনি বলেন- 'মোসলমানদের নামের পূর্বে শ্রী লিখিতে নাই।' এতে পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট ইসলামী নিয়মে পত্র লিখন পদ্ধতির কয়েকটি নমুনা তিনি নির্দেশ করেন। পুস্তকখানির সমালোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'বাসনা'তে বলা হয়-'পাড়াগাঁয়ের মুসলমান ছেলেরা—যে সকল বালক অর্থাভাবে নিবন্ধন গ্রাম্য পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্য এই পুস্তক উপকারী হইবে।' পুস্তকখানির রচনাকাল জানা যায়নি।

www.pathagar.com

রচনার তারিখ না পাওয়া আর একখানি পুস্তক 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ'। এতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনধারা, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ এবং পুনরায় ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী ও কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সকল পুস্তকের মধ্যে এটিতেই ভাষার দুর্বলতা দৃষ্ট হয়। মনে হয় এটি তাঁর প্রথম বয়স অর্থাৎ খৃষ্ট-ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের পরই অর্থাৎ ১৯০০ সালের পূর্বে রচিত।

শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীনের লেখা আরও বেশ কয়েকখানি পুস্তকের নাম পাওয়া গেলেও সেগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এগুলির মধ্যে উপদেশ ভাণ্ডার, দুই শত উপদেশ, খোস গল্প, হযরত বার্ণাবর (?), ইঞ্জিলের পেশ খবর প্রভৃতি উল্লেখ্য।

১৯৩০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন জীবনে একবার এক মস্ত ভুল করেছিলেন। তা হচ্ছে, ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ। কিন্তু দেখা যায়, পরবর্তীতে এই ভুলটিই তাঁর নিজের কাছে যতটুকু কল্যাণকর হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কল্যাণকর হয়েছে তৎকালীন এ দেশীয় মুসলমানদের কাছে। কারণ একদিকে খৃষ্টধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের ত্রুটি সম্পর্কে যেমন তিনি ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে এই পবিত্রতম ধর্মের মাহাত্ম্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভে তিনি সক্ষম হন। অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলেন তৎপর। তাঁর লব্ধ এই উভয় জ্ঞানের প্রকাশ করার জন্য দৃঢ় হস্তে কলম ধরেছেন তিনি। নস্যাৎ করে দিয়েছেন পাদ্রীদের অশুভ প্রচেষ্টাকে। বাঙালি মুসলমান সমাজকে কৃতিত্বের সাথে রক্ষা করেছেন এক চরম ক্ষতির হাত থেকে। এ জন্য বাঙালি মুসলিম সমাজ তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

www.pathagar.com

খান বাহাদুর আহছানউল্লা

১৮৭৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তৎকালীন খুলনা, বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত নলতা গ্রামে খান বাহাদুর আহছানউল্লা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত আলিম ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তৎকালীন সরকারের অধীনে শিক্ষা বিভাগের বিশেষ উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগীয় সহকারী পরিচালক। সে যুগে এমন সম্মানিত পদ এ দেশীয় কোনও বাঙালির ভাগ্যে জোটেনি। শিক্ষা বিভাগীয় চাকরিতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এ দেশের মুসলমানরা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। পিছিয়ে পড়েছে তাদের রীতিনীতিতে, সভ্যতায়, আচরণে, কৃষ্টিতে এবং শিক্ষা-দীক্ষায়। এ দেশের মুসলমানদের এ অধঃপতনকে লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই হতভাগ্য মুসলমানদের প্রতিটি দুর্বল আর হৃত অংগকে সজীব আর সতেজ করে তুলবার ব্রত নিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন এই মহান পুরুষ। ইসলাম ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য শক্তিশালী লেখনী হাতে বাংলা সাহিত্যের আসরে নেমে পড়েছিলেন তিনি সব্যসাচীর বেশে।

তিনি মোট ৫৭ খানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর এই মূল্যবান রচনাগুলিকে আমরা আটটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা ঃ

১. জীবনীবিষয়ক

খান বাহাদুর আহছানউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগরিত করে তুলবার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে হযরত মুহম্মদ (সা)-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় গুরুর জীবন কাহিনীকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার ঘটানো। তাঁদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি এবং শিক্ষায় এদেশীয় হৃতসর্বস্ব মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করে তোলা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি রচনা করেন 'ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' (১৯২৬), 'দরবেশ জীবনী' (১৯৩৪), 'মোস্তফা কামাল' (১৯৩৪), 'ইবনে সউদ' (১৯৩৫), 'আল্ ওয়ারেছ' (১৯৪৬), 'আমার জীবনধারা' (১৯৪৬), 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব' (১৯৪৯), 'বিশ্ব শিক্ষক হযরত মোহাম্মদ (দঃ)' (১৯৪৯), 'কুতুবুল আকতাব হযরত

www.pathagar.com

ওয়ারেছ আলী শাহ' (১৯৫০), 'ইসলাম রবি হযরত মোহাম্মদ (দঃ)' (১৯৫২), 'আউলিয়া চরিত' (১৯৫৭), 'জীবন স্মৃতি' (১৯৬২), এই ১২ খানি জীবনী গ্রন্থ। এ ছাড়াও ছোটদের উপযোগী করে সহজ-সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দু'খানি ক্ষুদ্র জীবনী-গ্রন্থ লেখেন। সেগুলি হচ্ছে-'পেয়ারা নবী' (১৯৪০) ও 'ছেলেদের মহানবী' (১৯৫১)।

২. কুরআন ও হাদীসবিষয়ক

কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা ছাড়া মুসলমানদের কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ নয়। তাই লেখক এই দুই পবিত্র গ্রন্থের পবিত্রতম শিক্ষা বর্ণনা করে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষাতে রচনা করেন এতদ্বিষয়ক ৮ খানি পুস্তক। সেগুলি হচ্ছে-'কুরআন ও হাদীসের আদেশাবলী' (১৯৩১), 'কোরানের সার' (১৯৩৬), 'হজরতের রচনাবলী' (১৯৪০), 'কোরানের শিক্ষা' (১৯৪১, 'কোরানের বাণী ও একত্ববাদ' (১৯৫১), 'বাংলা হাদীস শরীফ' (১৯৫২), 'হাদীস গ্রন্থ (১৯৫৬) এবং 'সংক্ষিপ্ত হাদীস' (?)।

৩. ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্যবিষয়ক

ইসলাম ধর্মের পরিচয় ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিয়ে তিনি ৪খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলিকে পবিত্র এ ধর্মের মূল কথারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শ্রেণীভুক্ত তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হচ্ছে-'ধর্ম শিক্ষা ও চরিত্র গঠন' (১৯২৯), 'আল্-ইছলাম' (১৯৩০), 'শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান' (১৯৩১), 'ইছলামের দান' (১৯৫৭)।

৪. ইসলামী বিধানবিষয়ক

ইসলামী বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। শুধুমাত্র মুখস্থ করা ধর্মীয় মন্ত্রের সমষ্টি কোনো ধর্মানুসারীকেই ধর্মীয় জীবনের পরিপূর্ণতা দিতে পারে না। ধর্ম ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বরং ধর্মে কলুষতাই সৃষ্টি করে। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের এই বিশেষ দিকটিতে লক্ষ্য রেখে তিনি রচনা করেন-'তরীকত শিক্ষা' (১৯৪০), 'মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য' (১৯৪৯), 'ইছলামের মহতী শিক্ষা' (১৯৪৯), 'ইছলাম ও জাকাত' (১৯৫১) ও 'ইছলামী তালিম' (১৯৫২)—এই ৫ খানি মূল্যবান গ্রন্থ।

৫. ইতিহাসবিষয়ক

আজকের দিনে মুসলমানরা শৌর্য-বীর্যহারা হয়ে পড়লেও একদিন তাঁরাই ছিলেন সবদিক দিয়ে পৃথিবীর সেরা জাতি। মুসলমানদের সেই পুরাতন গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এদেশীয় মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করে তুলবার জন্য বেশ কয়েকখানি ইতিহাস-গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সেগুলি হচ্ছে—'মোছলেম

www.pathagar.com

জগতের ইতিহাস' (১৯২৫), 'ইছলামের ইতিবৃত্ত' (১৯৬৪), 'আমাদের ইতিহাস' (১৯৪৮), ও 'ভারতের ইতিহাস' (১৯৪৯)।

৬. সাহিত্যবিষয়ক

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে দু'খানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তা হচ্ছে—'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' (১৯১৮) এবং 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৪৮)।

৭. ভূগোলবিষয়ক

বিশ্বের বিভিন্ন এলাকাতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে ক্ষুদ্র-বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ। এদের সবগুলির ভৌগোলিক পরিবেশ এক নয়। এসব রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করে রচিত তাঁর গ্রন্থগুলি হচ্ছে—'পাকিস্তান (১৯৪৯), 'মুসলিম জাহান' (১৯৬৩), 'মধ্যপ্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (?) ও 'বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ' (?)।

৮. অন্য ধর্মবিষয়ক

নিজে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও অপর ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। 'মণিমুক্তা যেখানে পাও কুড়িয়ে নাও'-এ পবিত্র হাদীসটির প্রতি তাঁর প্রবল আস্থা ছিল। তাই শুধু আপন ধর্মের নয়, এমনকি অন্য ধর্মের গুরুদের মহামূল্যবান উপদেশগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ করে তিনি উপহার দিয়েছেন এদেশের মুসলমানদের হাতে। তাঁর লেখা এতদ্বিষয়ক গ্রন্থগুলি হচ্ছে—'মহাপুরুষদের অমিয়বাণী' (১৯৫০), 'ইসলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি' (১৯৫৬) এবং 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' (১৯৬৪)।

৯. বিবিধবিষয়ক

এ ছাড়া ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সেগুলি হচ্ছে-'হেজাজ ভ্রমণ' (১৯২৯), নামাজ শিক্ষা' (১৯৩০), 'ভক্তের পত্র' (১৯৩৬), 'নামাজের সূরা' (১৯৪০), 'ছুফী' (১৯৪৭), 'সৃষ্টিতত্ত্ব' (১৯৪৯), 'দোয়া ও দরূদ' (১৯৪৯), 'প্রেমিকের পত্রাবলী' (১৯৪৯), 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা' (১৯৪৯), 'পাঁচ ছুরা' (১৯৫১) ও 'বাংলা মৌলুদ শরীফ' (১৯৬২)। এ ছাড়াও বিশেষ করে মুসলমান ছাত্রদের জন্য তিনি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

প্রায় পৌনে এক শতাব্দীকাল ধরে বাংলা সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সেবা করার পর ১৯৬৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৯১ বছর বয়সে নলতা গ্রামের স্বীয় বাসভবনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ময়েজজদ্দীন হামিদী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অধঃপতিত মুসলিম সমাজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে যাঁরা আত্মনিবেদিত হয়েছিলেন, মোহাম্মদ ময়েজজদ্দীন হামিদী তাঁদের প্রথম সারির একজন।

বাংলা ১৩০২ সালে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার হামিদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। এই হামিদপুর গ্রামের নামানুসারে তিনি হামিদী সাহেব নামে পরিচিত। এবং উক্ত পরিচিতি তাঁর নামের শেষে ব্যবহৃত হয়।

একটি ধর্মীয় পরিবারে তাঁর জন্ম। তাই শৈশবেই তিনি ধর্মীয় পরিবেশে লালিত-পালিত হতে থাকেন। শৈশবেই শুরু হয় তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা জীবন।

কিন্তু শিক্ষালয়ের গণ্ডিতে তাঁর মন বেশিদিন টেকেনি। সে সময় বাঙালি মুসলমানদের চরম অস্থিরতার কাল। বিদেশী কৃষ্টির আবর্তে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ চরম নৈরাশ্যময়তা তাদেরকে সীমাহীন দুর্বিপাকের মধ্যে নিমজ্জিত করে ফেলেছিল।

মুসলমানদের এ দুর্বিষহ অবস্থা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। তিনি উপলব্ধি করলেন, অধঃপতিত এই বাঙালি মুসলমান সমাজের মুক্তির একমাত্র পথ তাদের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি আর চেতনার পুনর্জাগরণ এবং তার বিকাশ সাধন।

তাই এই উদ্দেশ্যে তিনি ঘর ছাড়লেন। বেরিয়ে পড়লেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন পুণ্যময় ইসলামের মর্মবাণী। বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান করে সুললিত বক্তৃতার মাধ্যমে লক্ষ মুসলিমের মধ্যে জাগ্রত করতে থাকলেন পরম শাশ্বত সত্যের অনুভূতি। এমনি করে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার গোটা এলাকা জুড়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করলেন এক চরম অনুপ্রেরণা। বাঙালি মুসলমানেরা যেন ফিরে পেল তাদের হারিয়ে যাওয়া চির গৌরবময় প্রাণের স্পন্দন। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ ময়েজজদ্দীন হামিদী সাহেবের সাথে তুলনা হতে পারে এদেশের আর দু'জন ইসলাম প্রচারক সাহিত্যিক শেখ জমিরউদ্দীন এবং মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর। বস্তুত এক্ষেত্রে মোহাম্মদ ময়েজজদ্দীন হামিদী তাঁদেরই সমগোত্রীয়।

www.pathagar.com

শুধু বক্তৃতা বিবৃতি নয়, উপরিউক্ত দু'জন মনীষীর মত তিনিও সাহিত্য সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শুভ উদ্দেশ্য সাফল্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে। এ দেশীয় মুসলমানদের কল্যাণে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে তিনি অর্ধশতাধিক পুস্তক রচনা করেছিলেন।

তাঁর রচিত পুস্তকসমূহের একটি বিশেষ বিশেষত্ব আছে, যা সে যুগের খুব বেশি সাহিত্য সাধকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তা হচ্ছে, তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, বিশ্বের যে জাতি যতখানি উন্নতি লাভ করেছে, তা শুধুমাত্র পারলৌকিক উৎকর্ষে নয়, ইহলৌকিক সমৃদ্ধির গুণেও বটে। আর ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র পারলৌকিক চিন্তা নিয়েই নয়, ইহলোকের দায়িত্ব সম্পাদনেও বটে। তাইতো ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্যের কোনও স্থান নেই। তাই হৃতসর্বস্ব মুসলমানদের পারলৌকিক পথনির্দেশনার সাথে সাথে ইহলৌকিক সমৃদ্ধি ও চেতনারও যে সম্প্রয়োজন—এটা তিনি সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করলেন। তাই তাঁর লেখা অর্ধশতাধিক পুস্তকের মধ্যে কিছু পুস্তক যেমন আছে একান্ত পরলোক সংক্রান্ত এবং কিছু আছে সম্পূর্ণ ইহলোক বা পার্থিব বিষয়বস্তু ও জীবনধারা সংক্রান্ত। আবার এমনও কিছু পুস্তক আছে, যাতে আছে ইহলোক এবং পরলোক উভয়ের কথা। অর্থাৎ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার মত প্রয়োজনীয় কথা। আসলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তো তাই। তবে সবচেয়ে বড় কথা, যে লোকের কথাই তিনি বলুননা কেন, তার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু এক। আর তা হচ্ছে, পবিত্র ইসলাম ধর্মের ছত্রছায়ায় সমস্যা-সংকুল বিশ্বকে এক পরম শান্তিময় জীবন, তথা সুসজ্জিত সমাজ গড়ে তোলা। তাঁর কয়েকখানি পুস্তক আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

মুসলমানদের পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ আল্ কুরআন। এটি একখানি গ্রন্থমাত্র নয়, গোটা বিশ্বাসী মানব সমাজের জীবন দর্শন, গোটা জীবনের পথ-প্রদর্শক। এই আল্ কুরআনের অনুসরণ ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কোন উন্নতি সম্ভব হয়নি। এমনকি বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মূলেও আল্ কুরআনের অবদান অনস্বীকার্য। তারই প্রমাণে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'বিজ্ঞানে কুরআনের অবদান' (১৩৫৭ বাংলা) এতে বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্ কুরআনের অবদানকে তিনি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে বর্ণনা করেছেন।

আল্ কুরআনের পর হাদীস। মুসলমানদের দ্বিতীয় গ্রন্থ।আখেরী নবীর পবিত্র বাণীকে সহজবোধ্য বাংলা ভাষাতে রচিত 'হাদিছ শিক্ষা'(১৩৫৫) এবং 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও হজরতের ভবিষ্যৎবাণী' (১৩৪২) গ্রন্থ দু'খানি। আল্লাহ্‌র প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁর প্রশস্তি নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'মিলাদে মোস্তফা' (?)। মিলাদের গুরুত্ব সম্পর্কে এ পুস্তকে বিস্তারিত পুংখানুপুংখ আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চার তরিকার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রচিত 'মারেফত দর্পণ' (১৩৬২) একখানি উন্নত শ্রেণীর চিন্তাধারার সমন্বিত পুস্তক। সুবৃহৎ কলেবরের এ পুস্তকখানি শুধুমাত্র সাধারণ মুসলিম সমাজেরই নয়, বাঙালি আলিম সমাজেও বিশেষ সমাদৃত হয়।

ইসলামের রীতিনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে মুসলমানরা হয়ে পড়েছিল ভ্রান্ত পথের পথিক। এ ব্যাপারে তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দানের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিনি রচনা করেন 'মছলা ভাণ্ডার'। ১৩৬০ সনে এটি প্রকাশিত হয়। সর্বমোট ৬টি খণ্ডে রচিত গ্রন্থটি হতে তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে মুসলিম পুনর্জাগরণের জন্য যেসব বক্তৃতা-বিবৃতি তিনি প্রদান করেন,তারই সমন্বয়ে গ্রথিত গ্রন্থ 'ওয়ায়েজ ভান্ডার' প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ সনে। তিনখণ্ডে এটি রচিত।

দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত বিরাট কলেবরের গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে হামিদীয়া' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৩৬৫ সনে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রশ্নসমূহের জবাব দিয়েছেন তিনি তাঁর নিজস্ব সহজ-সরল ভাষাতে।

আল্লাহ্‌র প্রতি হৃদয়ে ভক্তি স্থাপনের অন্যতম পথ হচ্ছে 'যিকর'। ইসলামে 'যিকর'-এর গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণনা করে তিনি রচনা করেন 'জলী জেকর সম্বন্ধে সত্য প্রচার' ও 'মাছজেদে মীলাদ ও জলী জেকর' গ্রন্থ দু'খানি। প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৪১ এবং ১৩৭৬ সনে।

বিদেশী কৃষ্টির সংস্পর্শে এ দেশীয় মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্ত রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। মুসলমানদের মধ্যে এই বেদআতী কার্যকলাপ লক্ষ্য করে তিনি ব্যথিত হলেন। এর ক্ষতিকারকতা ও তা থেকে মুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়ে তিনি লিখলেন 'শেরেক বর্জন' (১৩৬৫) ও 'বেদআতী দলন' (১৩৭৪) গ্রন্থ দু'খানি।

সে সময় খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা এ দেশীয় মুসলমানদের বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্ষতিকর অবস্থার বর্ণনা এবং তা থেকে সতর্ক হয়ে মুক্ত থাকার জন্য তাঁর রচিত 'খৃষ্টান মিশনারীদিগের অশুভ পাঁয়তারা' (১৩৭৪) গ্রন্থখানি তৎকালীন বিদেশী শাসকদের বিরাগভাজন হলেও বাঙালি মুসলমানদের কল্যাণ করে।

ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠতম 'রোকন' নামায। একে বাদ দিয়ে কেউই মুসলমান নামের দাবিদার হতে পারে না। এই নামাযের কিছু বিধি-বিধান আছে যা অবহিত হওয়া প্রতিটি মুসলমানের একান্ত প্রয়োজন। নামায সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-বিবরণ দিয়ে রচনা করেন 'বৃহৎ নামাজ শিক্ষা' (১৩৫০) গ্রন্থখানি। প্রতিটি নামাযে

www.pathagar.com

আছে কিছু কিছু অজিফা। তার বিবরণ দিয়ে রচিত গ্রন্থ 'সরল অজিফা শিক্ষা' (১৩৫৪)। সাধারণ জ্ঞানের মুসলমানদের নামায শেখার জন্য রচনা করেন 'সরল নামাজ শিক্ষা' (১৩৫৫) গ্রন্থখানি।

নারীরাও তো সংসারের এবং সমাজের অংশ। তাদেরওতো দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে একটা সংসার আর সমাজকে সুখী করে গড়ার। যার মাধ্যমে তাদের নিজের অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনেরও কল্যাণ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে রচিত তাঁর এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ 'রমণী কণ্ঠহার' তৎকালীন মুসলিম নারী সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৩৪০ সনে এটি প্রকাশিত হয়। অধিক জনপ্রিয়তার জন্য অল্পদিনের মধ্যে গ্রন্থখানির বেশ কয়েকটি সংস্করণ বের হয়।

নারীদের জন্য কি ঈদের জামায়াত জায়েজ? এ সম্পর্কে ধর্মের আলোকে বিশদ আলোচনা আছে তাঁর লেখা 'নারী ও ঈদের জামায়াত' গ্রন্থে। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৩৭১ সন।

ইসলামের পঞ্চ 'রুকন'–এর অন্যতম 'হজ্জ'। এই হজ্জের নিয়ম–কানুন নিয়ে রচিত 'হজ্জ দর্পণ'। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সনে।

জীবনের সার্বিক অবক্ষয় থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলামী পন্থায় জিহাদ। তৎকালীন পথভ্রষ্ট বাঙালি মুসলমানদেরকে সেই পথেরই ইংগিত দিয়ে তিনি রচনা করেন 'মুক্তির বাণী' গ্রন্থখানি। প্রকাশকাল ১৩৭২ সন।

জুমা এবং ঈদের জামাতে পঠিত খুতবাহ মুসলমানদের সমকালীন জীবনের দিকনির্দেশনা। কিন্তু এর আরবী পঠনে আরবী অজ্ঞ মুসলমানদের দুর্বোধ্যতার কথা স্মরণ করে বিশ্বখ্যাত খোতবাহ ইব্‌নে নাবাতা (র)–র মূল আরবীসহ সম্পূর্ণ খুতবাহর প্রাঞ্জল অনুবাদ করে নাম দিলেন 'বঙ্গানুবাদ খোতবাহ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সনে।

মনীষীদের জীবনাদর্শ আমাদের মানুষের সুষম জীবনযাত্রার পাথেয়। তাঁদের বাণী আমাদের দিক্‌নির্দেশনা। ফুরফুরা শরীফের পীর কিবলাহ হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র)–র মহামূল্যবান উপদেশসমূহের সংকলনে 'ফুরফুরা পীর ছাহেবের অছিয়তনামা' গ্রন্থখানি তিনি রচনা করেন। ১৩৬০ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

উপমহাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম মনীষীকে নিয়ে তিনি রচনা করেন 'পাক–ভারতের আউলিয়া পরিচয়'। প্রকাশকাল ১৩৭২ সন।

তাঁর লেখা আরও কয়েকখানি ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে 'তাবিজের কেতাব' (১৩৪৪), 'বিবাহের মাছায়েল' (১৩৫৪), 'খোয়াবনামা' (১৩৫৮) অন্যতম।

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় পার্থিব প্রয়োজন সংক্রান্ত পুস্তকসমূহের অন্যতম হচ্ছে–'লক্ষপতি' (১৩৩৯), 'বিষ চিকিৎসা' (১৩৬২), 'পশু চিকিৎসা' (১৩৬৮), 'ধূমপানের অপকারিতা' (১৩৭০) ইত্যাদি।

মোহাম্মদ ময়েজজদ্দীন হামিদী ছিলেন উনবিংশ–বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্য–সাধক। নিজস্ব প্রতিপত্তি অথবা সুনাম নয়, তৎকালীন অধঃপতিত পথভ্রষ্ট বাঙালি মুসলমান সমাজের সমৃদ্ধি আর কল্যাণই ছিল তাঁর সাহিত্য চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর প্রতিটি রচনায় ভাষার সাবলীল প্রাঞ্জলতা, দরদী প্রকাশ, বিষয়বস্তুর নির্বাচন মানসিকতাসমূহই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সে জন্যই তিনি উপমহাদেশের বাঙালি মুসলমানদের কাছে চিরস্মরণীয়।

১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট জন্মভূমি হামিদপুরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

* গ্রন্থের উল্লিখিত প্রকাশকাল বাংলা সনে।

www.pathagar.com

শেখ আব্দুল জব্বার

বাংলার মুসলমানদের চরম অধঃপতনের যুগে যে কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক অধঃপতিত মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণের ব্রত নিয়ে বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োজিত হয়েছিলেন, শেখ আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

ইংরাজী ১৮৮১ সালের ২৮শে জানুয়ারি মুতাবেক বাংলা ১২৮৯ সালের ১৫ই মাঘ ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার বনগ্রামে শেখ আবদুল জব্বারের জন্ম। পিতা শেখ নেকবর হোসেন আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল থাকলেও অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। তাই পুত্রকে আরবী-ফার্সী শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় পাঠান। কিন্তু যখন তিনি সবেমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি পিতৃহীন হয়ে পড়েন। ফলে সেখানেই তাঁর পাঠ্য জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

স্বল্প শিক্ষিত হলেও শেখ আবদুল জব্বার তীক্ষ্ণ মেধা আর বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কৈশোরে, এমনকি বলা যেতে পারে শিশু বয়স থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাই নিম্ন শ্রেণীর স্বল্পকালীন ছাত্র জীবনে 'প্রবাসী', 'মিহির', 'সুধাকর,' 'কোহিনূর', 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি পত্রিকাতে তাঁর লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগে এ দেশীয় মুসলমানগণ ছিলেন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিহারা এবং দিশারীবিহীন। তাই ধর্মীয় চেতনার মাধ্যমে তাঁদের পুনর্জাগরণের ব্রত নিয়ে তিনি লেখনী ধারণ করেন। তাঁর লেখা বেশ কিছুসংখ্যক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রকাশে কালানুক্রমে সেগুলি সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে প্রতিটি পুস্তকের প্রকাশকাল বাংলা সন হিসেবে উল্লেখ থাকায় সেই মুতাবিকই আলোচনা করা হচ্ছে।

লেখকের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'মক্কা শরীফের ইতিহাস'। প্রকাশকাল ১৩১৩ সাল। বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র কিবলাহ্ কাবা শরীফের নির্মাণ, পূর্ব ইতিহাস, এর রক্ষণাবেক্ষণ, মাহাত্ম্য, প্রভৃতি বিশদভাবে গ্রন্থের ভূমিকাতে একথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। মুন্‌শী শেখ জমিরউদ্দীন সাহেব গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছিলেন। ৯৭ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানি ঢাকার 'জীনাত' প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

১৩২০ সালে প্রকাশিত হয় 'হজরতের জীবনী'। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম বৃত্তান্ত, জীবনধারা, তাঁর আদর্শ উপদেশ সম্বলিত এ গ্রন্থখানি মুসলিম সমাজের একটি মূল্যবান পাথেয়। শুধুমাত্র মুসলমানদের নয়, তাঁর রচনাগুণে গ্রন্থখানি সর্ব ধর্মাবলম্বীদের কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। যার ফলে এটি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসেবে সিলেবাসভুক্ত হয়।

একই বছরে প্রকাশিত হয় আরও দু'খানি জীবনী-গ্রন্থ। একখানির নাম 'নূরজাহান বেগম' এবং অপরখানির নাম 'দেবী রাবেয়া'। 'নূরজাহান বেগম সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য উদ্ধার সম্ভব হয়নি। তাপসী হযরত রাবেয়া বসরীর সাধনা জীবন নিয়ে রচিত 'দেবী রাবেয়া'। গ্রন্থখানি তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিশেষ সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছিল। বিষয়বস্তুর শুচিতা, ভাষার পরিচ্ছন্নতা আর বর্ণনার প্রাঞ্জলতাই এর কারণ বলে মনে হয়। 'অনল প্রবাহ'-এর কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেব গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এটিও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসেবে সিলেবাসভুক্ত হয়। কোলকাতার মখদুমী লাইব্রেরী থেকে খানবাহাদুর মোবারক আলী গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

১৩২৪ সালে 'গাজী' নামে তাঁর লেখা আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এ গ্রন্থখানি সম্পর্কেও বেশি কিছু জানা যায়নি। আদি মানব-মানবী হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার সৃষ্টি কাহিনী ও তাঁদের পৃথিবীতে আগমন, সাধনা জীবন ও তথ্যবহুল ঘটনাবলী নিয়ে তাঁর রচিত 'আদম হাওয়া' জীবনী গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। গফরগাঁয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শতদল বিহারী চাকলাদারের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থখানি প্রকাশ বলে উল্লিখিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এটি এ দেশীয় মুসলমানদের জন্য লেখকের একটি পবিত্র সওগাত। গ্রন্থখানি তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। যার ফলে মাত্র কিছু দিনের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়; এবং পাঠকদের চাহিদাক্রমে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের আলোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'বাসনা' লিখেছিল- এই উপাদেয় গ্রন্থখানার প্রথম সংস্করণের সমালোচনাকালে আমরা মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। যাহা আদরের জিনিস তাহা যদি সাদরে পরিগৃহীত হয়, তবে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? তাই যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে 'মক্কা শরীফের ইতহাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখনী ধারণ সার্থক। কি লিপি নৈপুণ্য কি ছাপার পরিপাট্য, কি তথ্য সংগ্রহ সকল বিষয়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে।...বাংলা সাহিত্য একখানি মূল্যবান গ্রন্থ লাভ করিল।'

www.pathagar.com

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদীনা শরীফের ইতহাস'। ১৩১৪ সালে গ্রন্থকারের নিজ প্রকাশন ও তত্ত্বাবধানে ঢাকার আলেকজাণ্ডার স্টীম মেশিন প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হয়। রসূলে পাক (সা)–এর রওযাভূমি পাক মদীনা মনওয়ারার প্রাচীন ইতিহাস, তথাকার মসজিদ ও অন্যান্য পুণ্যস্থানসমূহের বর্ণনা এবং রসূলে করীম (সা)–এর ঘটনা ও তথ্যবহুল জীবনী আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থখানির ভাষা পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। এটিও তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়, যার ফলে এ গ্রন্থখানিরও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৎকালীন 'উপাসনা' পত্রিকা গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। এর সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৯২।

তৃতীয় গ্রন্থ 'ইসলাম চিত্র ও সমাজ চিত্র'। প্রকাশকাল একই বছর। অর্থাৎ ১৩১৪ সাল। পবিত্র ইসলাম ধর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও মুসলমানদের সামাজিক জীবনে তার সুষ্ঠু প্রতিফলনের উপকার ও প্রয়োজনীয়তা এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য। গ্রন্থখানি শুধু তৎকালীন নয়, চিরকালীন মুসলমানদের জন্য আদর্শ পথ প্রদর্শক।

ধর্মীয় উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত সমষ্টি নিয়ে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয় 'ইসলাম সঙ্গীত'। এতে আছে হাম্‌দ, না'ত, গজলসহ মুসলিম ঐতিহ্যময় সঙ্গীত সমষ্টি, যা তৎকালীন মুসলিম রেনেসাঁয় অযুত শক্তির কাজ করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থখানিও সে যুগের মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা 'আদর্শ রমণী' গ্রন্থখানি। কয়েকজন আদর্শ মুসলিম মহিলার বীরত্বপূর্ণ সাধনা জীবনের বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থে। এসব মহিলার মধ্যে সখিনা খাতুন, জোবায়দা খাতুন, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল, দেবী রাবেয়াসহ রয়েছে 'আমিনার সংসার জীবন' ও 'রমণীর কর্তব্য' শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ। এছাড়াও আলোচ্য গ্রন্থে রয়েছে তাঁর দু'টি মূল্যবান সম্পাদনা। একটি আব্দুল করীম লিখিত 'নওয়াব শামসুজ্জামান' শীর্ষক নিবন্ধ এবং অপরটি শেখ ফজলুল করীম লিখিত 'বিশ্বাসের পুরস্কার' শীর্ষক কবিতা। মুসলমান নারী সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য লেখক গ্রন্থখানি রচনা করেন। এতে লেখক উল্লিখিত মহিলাদেরকে আমাদের নারী সমাজের পথনির্দেশিকা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করে তিনি আশা করেছিলেন, এ দেশীয় মুসলিম রমণীরাও তাঁদের মত চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়ে তাঁদের দুঃখময় সংসার জীবনকে অনন্ত সুখময় করে তুলুন। প্রতিটি গৃহ হয়ে উঠুক 'স্বর্গের নন্দন কানন'। লেখকের এ সুপ্রত্যাশা নিঃসন্দেহে উন্নততর। গ্রন্থখানির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭৪।

১৩১৭ সালে প্রকাশিত 'জেরুজালেম বা বয়তুল মকাদ্দসের ইতিহাস' তাঁর লেখা ষষ্ঠ গ্রন্থ। মুসলমানদের আদি পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিপূর্ণ ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থে। দিল্লীর মওলানা আব্দুল হক সাহেবের সংকলিত ও মৌলবী

www.pathagar.com

আলাউদ্দীন আহমদের 'ইসলাম প্রচারক' গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেন। করেন লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আব্দুর রশীদ।

এ ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক উন্নতমানের পাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেন। সেগুলি হচ্ছে–সচিত্র শিক্ষা সোপান, সাহিত্য পাঠ, আদর্শ সাহিত্য, শিশু সোপান, ইসলামীয়া বাল্য শিক্ষা, আদর্শ নূতন পত্র দলিল শিক্ষা ও আদর্শ বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা।

১৩২৬ সালের (১৯৪০) ১১ই ফাল্গুন সোমবার মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর এই সাহিত্য সাধক ঢাকাতে ইন্তিকাল করেন।

শেখ আব্দুল জব্বারের রচিত প্রতিটি পুস্তকের রচনাশৈলী ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। এবং সেজন্যই ছিল সর্ব হৃদয়গ্রাহী। এ ছাড়াও তেজস্বী লালিত্যময় রচনা রীতির মাধুর্যও তাঁকে দক্ষ সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।

সর্বোপরি তাঁর প্রতিটি রচনারই উদ্দেশ্য ছিল পবিত্রতম, মহৎ। সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রচারণা নয়, সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এ দেশীয় অধঃপতিত মুসলিম সমাজের মধ্যে রেনেসাঁ আনয়ন করতে সহায়তা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর এ শুভ লক্ষ্য অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাই এ দেশীয় বাঙালি মুসলিম সমাজ তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

১৮৮৬ সাল।

সময়টা ছিল এ দেশে হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের যুগ। রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে যে হিন্দু ধর্ম সংস্কার সাধন হয়েছিল, এ সময় তা চরম পর্যায়ে চলতে থাকে। বিশেষ করে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত 'আর্য সমাজ'–এর মাধ্যমে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এতে করে এ দেশের অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ দেশের মুসলমানরা। কারণ, এই আন্দোলনের মূল ভূমিকা ছিল ইসলাম ধর্ম আর আচার–আচরণের বিরোধী।

এ সময় বাঙালি মুসলমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে হীনবল হয়ে পড়ে। তাদের ধর্মকর্ম, রীতিনীতি, আচার–আচরণ থেকে তারা শুধু দূরেই চলে যায়নি, এমনকি অনেকখানি হিন্দু প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সত্যিকার শিক্ষার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। যার ফলে অশিক্ষা–কুশিক্ষা তাদের কঠিনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিভিন্ন বিজাতীয় কুসংস্কারের মধ্যে তারা জড়িয়ে যায়। এতে করে রুদ্ধ হয়ে যায় তাদের জাতীয় ব্যক্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ। এ দেশের গোটা মুসলিম জাতিই হয়ে পড়ে ভ্রান্ত, পথহারা অন্ধ পথিক। নিমজ্জিত হয় তারা চরম দুর্দশাময় অতিশপ্ত বলয়ে।

ঠিক এমনি সময় ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, বাংলা ১২৯৩ সালে ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত মাগুড়াডাঙ্গা গ্রামে মুসলিম পুনর্জাগরণের অন্যতম সাধক, সাহিত্যিক, সমাজসেবক, বাগ্মী, সাংবাদিক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল এনায়েত উল্লাহ এবং মাতা মোসাম্মাৎ সোন্নাতুন্নেছা। পিতা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে এয়াকুব আলী ছিলেন কনিষ্ঠ।

শৈশবে তিনি পিতাকে হারিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর কাছেই লালিত–পালিত হতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রথমে পাংশা এম. ই. স্কুল থেকে এবং

www.pathagar.com

পরে রাজবাড়ী আর. এস. কে. হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর ভর্তি হন কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানেই তাঁর শিক্ষা জীবন চলতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য! বি. এ, ক্লাসে অধ্যয়নকালে হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে তিনি আর উক্ত পরীক্ষা দিতে পারেন নি। অবশ্য দীর্ঘ চিকিৎসার পর তিনি আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান বটে, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা এবং সুযোগ তখন তাঁর আর ছিল না। কারণ, ইতিমধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রওশন আলী চৌধুরীও ইন্তিকাল করেছেন।

এরপর ভাগ্য অন্বেষণ। আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চাকরি গ্রহণ। শিক্ষকতাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ পেশা হিসাবে মনে করলেন। কারণ, এ দেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত, অধঃপতিত মুসলমানদের দুর্দশাময় অবস্থা দেখে তিনি বুঝলেন, এদের মুক্তি আর উন্নয়নের জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে, এদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। আর এ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ৭ বছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে মুসলিম মুক্তির আহবান মওলানা মোহাম্মদ আলীর খেলাফত আন্দোলনে শরিক হওয়ার অপরাধে তাঁর চাকরি চলে যায় এবং তিনি প্রথমে স্বগৃহে নজরবন্দী ও পরে কারারুদ্ধ হন।

কোলকাতার দম্‌দম্‌ জেলখানায় তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এ সময় কারাভ্যন্তরে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে কয়েকজন বিপ্লবী নেতার। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী ও মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ভ্রাতৃদ্বয় এবং সৈয়দ শামসুর রহমান প্রমুখ। এঁদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মধ্যে মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের চেতনা আরও দৃঢ়তর হয়। তাই জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি আর শিক্ষকতায় ফিরে না গিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন। কারণ, তখন তিনি মনে করলেন এ দেশের মুসলমানদের অতীত কৃষ্টি আর সভ্যতাকে ফিরে পেতে হলে তাঁদের রাজনৈতিক মুক্তির প্রয়োজনই সর্বাগ্রে। রাজনীতিতে এসে তিনি যাঁদের সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করেন, তাঁরা হচ্ছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমউদ্দিন প্রমুখ।

কিন্তু সেবক এয়াকুব আলী চৌধুরীর সিদ্ধান্তের স্থিরতা নেই। তিনি ভাবলেন, এ দেশের অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য উপরিউক্ত নেতাদের ভূমিকাই যথেষ্ট। তাই তিনি নিলেন অন্য পথ। সাংবাদিকতা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রওশন আলী চৌধুরীর সম্পাদনায় সে সময় 'কোহিনূর' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এ দেশের মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্নয়ন ঘটানোই ছিল পত্রিকাখানির মূল উদ্দেশ্য। ১৮৯৮ সালে পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। সেই থেকে ১২ বছর, অর্থাৎ ১৯১০ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯১১ সালে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী পত্রিকাখানির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন অত্যন্ত দক্ষতা ও কৃতিত্বের সাথে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। 'কোহিনূর'–এর সম্পাদক থাকাকালে তিনি উক্ত পত্রিকাতে মুসলিম পুনর্জাগরণমূলক বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন, যেগুলি পরবর্তীতে সংকলিত হয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত সময় মুসলিম কৃষ্টিমূলক আরও যে কয়খানি পত্রিকা তখন প্রকাশিত হতো, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাসিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক আহলে হাদীস, সাপ্তাহিক সুলতান, মুসলিম হিতৈষী, মিহির, হাফেজ, ইসলাম প্রচারক, দৈনিক নবযুগ ইত্যাদি। এ সমস্ত পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিতভাবে নিবন্ধমূলক লেখা লিখতেন।

এমনিভাবে শুরু হয় তাঁর সাহিত্য সাধনা। বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে সাহিত্যকে তিনি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত প্রথম গ্রন্থখানির নাম 'নূরনবী'। প্রথম প্রকাশনার তারিখ জানা যায় না। তবে ইংরাজী ১৯১৩, মুতাবেক বাংলা ১৩২০ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি একটি কিশোর–গ্রন্থ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর জীবন ও আদর্শকে শিশু–কিশোরদের জন্য অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি এটি রচনা করেন। গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন–'লেখক এই গ্রন্থে গল্পের ভাষায় অতি নিপুণতার সহিত হজরত মোহাম্মদ (স) পবিত্র জীবন–কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ছোট ছোট ছেলে–মেয়েরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। তাই লেখক গল্পের ভিতর দিয়াই হজরতের মহৎ চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।' গ্রন্থখানির ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন–'ইহার ভাষা সহজ ও সুন্দর।. . . .এইরূপ বাংলা ভাষায় লেখা কঠিন কাজ।'

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম 'ধর্মের কাহিনী'। ইংরাজী ১৯১৪, মুতাবিক বাংলা ১৩২১ সালে এটি প্রকাশিত হয়। লেখকের বয়স তখন ২৮ বছর হলেও এটি তার কিশোর বয়সের রচনা। কিন্তু রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুতে তাঁর এই কৈশোরত্বের ছাপ নেই। বরং পরিণত বয়সেরই রচনা বলে ভ্রম হয়। দৈনন্দিন জীবন সমস্যায় ধর্ম যে মানুষকে কতবড় সমাধান দিতে পারে, অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, সুন্দর, সাবলীল, প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক তারই বর্ণনা দিয়েছেন এ গ্রন্থে। গ্রন্থখানির প্রশংসা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেন–'সৃষ্ট বীজ ও গৃহ পরিবেশ অনুকূল হলে এক একটি চিত্তের ধর্মসার গ্রহিতা ও সর্বাঙ্গ সুন্দর সাধু জীবন লিপ্সা আবাল্যের সত্য সাধনায় কতোখানি বৃহৎ, ব্যাপক ও

www.pathagar.com

ব্যঞ্জনাময় হতে পারে, ব্যক্তি ও সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরী তারই একটা মনোরম নিদর্শন।' লক্ষ্যণীয় যে, গ্রন্থখানি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর ব্যক্তি মানসকেও উন্মোচন করেছেন।

তৃতীয় গ্রন্থ 'শান্তিধারা'। গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশকাল জানা যায় না। তবে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ইংরাজী ১৯২২, মুতাবিক বাংলা ১৩২৯ সালে। পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত মোট ৬টি প্রবন্ধ এতে সংকলিত হয়। প্রবন্ধগুলির নাম হচ্ছে–'ইসলামের স্বরূপ, 'রমজান,' 'আজান,' 'উপাসনা' ও 'নামাজ'। নামকরণের মধ্যেই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট। বাস্তুত এটি মুসলমানদের জন্য চৌধুরী সাহেবের এক অনন্য সওগাত। গ্রন্থখানি সম্পর্কে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র বাংলা ১৩২৯ সালের কার্তিক সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়–'ইসলামকে সত্য করিয়া চিনিবার, সুন্দর করিয়া দেখিবার, গভীর করিয়া ভাবিবার ইহাই বঙ্গ সাহিত্যের একমাত্র পুস্তক।' আলোচ্য গ্রন্থের 'নামাজ' প্রবন্ধটির পাঠ মোহাম্মদ এয়াকুব আলীর মুখে শুনে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগে রায়বাহাদুর জলধর সেন বলেছিলেন–'এ যদি হয় মুসলমানের নামাজ, তাহলে আমিও মুসলমান।'

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী রচিত চতুর্থ ও শেষ গ্রন্থখানির নাম 'মানব মুকুট'। ইংরাজী ১৯২৬, মুতাবিক বাংলা ১৩৩৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। মোট ৬টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে গ্রন্থখানি রচিত। প্রবন্ধগুলি হচ্ছে–'মহাপুরুষের মানবতা,' 'মানুষের অধিকার', 'প্রাণের প্রতিধ্বনি,' 'সত্য সাধনা', 'প্রতিষ্ঠায়' ও 'পালনে'। এ ছাড়াও 'প্রস্তাবনা' শীর্ষক একটি মূল্যবান ভূমিকাও গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজিত হয়েছে। মানব মুকুট বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর চারিত্রিক আলোকে এ দেশীয় মুসলমানদের চরিত্র গঠনের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রন্থখানি রচিত হলেও এর বিষয় ভঙ্গিমার সাথে নীতিবিদ সাহিত্যিক ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সাযুজ্য আছে।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাহিত্য চর্চা ও সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় কৃষ্টি, রীতিনীতি, আচার–আচরণের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাদের পুনর্জাগরণ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান। এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর প্রতিটি রচনার মূল উদ্দেশ্যও ছিল তাই। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিকও সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত হন। এঁদের মধ্যে সুসাহিত্যিক কাজী ওদুদ, ডাঃ কাজী লুৎফর রহমান, ডঃ মোতাহার হোসেন প্রমুখ অন্যতম। এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। এ ছাড়া তাঁর সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন–মওলানা আকরম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কাজী ইমদাদুল হক, কবি কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম,

www.pathagar.com

কবি শাহাদৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ। সাহিত্য জীবনে তিনি এঁদের সবারই সান্নিধ্য লাভ করেন।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী মনে-প্রাণে একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর পরম মমত্ববোধ। ইসলামের প্রতিটি অনুশাসনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা, তাই তিনি বলেন-'মুসলমানেরা যদি এ কবির আত্মার সত্য অনুভূতির মহিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতে পারিত তবে তাহার শক্তির অন্ত থাকিত না।' গভীর আস্থায় তিনি বলেন-'জানি না, যে কলেমা পড়ে, সে কেমন করিয়া মিথ্যা বলে, যে নামায পড়ে সে কেমন করিয়া সত্যের জন্য প্রাণপণ না করিয়া থাকিতে পারে।...যে রোযা করে, সে কেমন করিয়া দুঃস্থ পীড়িত ও বুভুক্ষের মুখে অন্ন না দিয়া শান্তি পায়।'

পবিত্রতম ধর্ম ইসলামের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, মুসলিম সমাজের অকৃত্রিম দরদী সুহৃদ, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইসলাম প্রচারক এই খাঁটি মানুষটি শেষ জীবনে অর্থ কষ্টের মধ্যে নিপতিত হন। নিজে সারাজীবন অবিবাহিত থেকে সাংসারিক ঝামেলামুক্ত হয়ে থাকতে চাইলেও মৃত ভাইয়ের অসহায় সংসারের বোঝা তাঁকে সারাজীবন টেনে বেড়াতে হয়। অসীম পরিশ্রমও করতে হয় তাঁকে। যার জন্য শেষ বয়সে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন এবং অনেকদিন রোগ ভোগের পর একরকম বিনা চিকিৎসাতেই ইংরাজী ১৯৪০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ৫৪ বছর বয়সে জন্মভূমি ফরিদপুরের পাংশাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

www.pathagar.com

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

সারাজীবন অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও সমাজের কল্যাণ ভাবনায় যাঁরা নিজের জীবন সাধনাকে উৎসর্গ করে গেছেন, ডাঃ লুৎফর রহমান তাঁদের অন্যতম।

আজ থেকে এক শতাব্দী আগে ১৮৮৯ সালে বর্তমান মাগুরা জেলার (তৎকালীন যশোর জেলা) পারনান্দুয়ানী গ্রামে ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। এটি তাঁর মাতুলালয়। পৈত্রিক নিবাস পার্শ্ববর্তী হাজীপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ময়েনউদ্দীন জোয়ারদার। মাতা বেগম শামসুন্নাহার।

শৈশবে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হলেও তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় হাজীপুরের একটি মাইনর স্কুলে। উক্ত স্কুল থেকে পাঠ সমাপনান্তে তিনি ভর্তি হন মাগুরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। কিছুদিন পর সেখান থেকে চলে গিয়ে ভর্তি হন হুগলী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথেই তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। এটা ১৯১৫ সালের কথা। কবি গোলাম মোস্তফা তখন এ কলেজের ছাত্র। একই শ্রেণীর।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান একজন প্রতিভাধর ও মেধাসম্পন্ন ছাত্র হলেও এ সময় তাঁর মন পড়াশুনার দিক থেকে অন্যমুখী হয়ে যায়, অবক্ষয়িত সমাজের মর্মন্তুদ চিত্র তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করে। তাই পাঠ্য পুস্তকের পড়াশুনার চেয়ে ক্ষয়িত সমাজের দুর্দশার ছবি তাঁকে অধিকতরভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। দিশেহারা সমাজের পথভ্রান্ত মানুষগুলির ব্যর্থতার ক্রন্দন গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করতে থাকে তাঁর বুকের সহমর্মী অনুভূতিতে। আর এটাই হলো তাঁর পাঠ্য জীবনের ক্ষতিগ্রস্ততার অন্যতম কারণ। দুঃখজনকভাবে বিদায় গ্রহণ ঘটলো তার ছাত্র জীবনের। অভিভাবকের অনেক আশায় ছাই দিয়ে এফ. এ. পরীক্ষাতে অকৃতকার্য হয়ে হলেন তিনি অন্য পথের পথিক।

কিন্তু তিনি যা ভেবেছিলেন, হলো তার অন্য। লুৎফর রহমানের ধারণা ছিল, পরীক্ষাতে অকৃতকার্য হলেও সমাজের একজন নিষ্ঠ সেবক হিসেবে তিনি হবেন গর্বিত পিতার সন্তান। কিন্তু কঠিন বাস্তবের সম্মুখে তাঁর সে নির্ভরতা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। তাছাড়া পিতার অমতে বিয়ে করায় পড়লেন পিতার রোষাণলে। হলেন পিতার

www.pathagar.com

স্নেহ থেকে বঞ্চিত। সমাজ দরদী মানব প্রেমিক লুৎফর রহমানের আত্মত্যাগের মূল্যায়ন তাঁর আত্মীয়-পরিজন কারও কাছে হলো না। অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে নিজের জনের সহানুভূতি তিনি হারালেন। তাই তাঁর পড়াশুনার ইতি ঘটলো এখানেই।

সমাজপ্রেমিক যুবক লুৎফর রহমান দু'চোখে দেখলেন অন্ধকার। সমাজের প্রতি উৎসর্গীকৃত জীবনটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি চললেন জীবিকার সন্ধানে। একজনার নয়, দু'জনার। ইতিমধ্যে স্বগ্রামের এক কিশোরী আয়েশা খাতুনকে স্বীয় ইচ্ছাতেই গ্রহণ করেছেন তাঁর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে। সুতরাং কঠিন দায় দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে।

পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবিকার সন্ধানে ছুটলেন তিনি নানাস্থানে। প্রথমে সিরাজগঞ্জে। সেখানে একটা স্কুলে অতি সামান্য বেতনে একজন সহকারী শিক্ষকের পদে যোগ দেন। কিন্তু এখানে মাত্র অল্পদিন চাকরি করার পর চলে গেলেন চট্টগ্রামে। সেখানে নিলেন একই চাকরি। শিক্ষকতা। জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলে। কিন্তু বেতন খুব বেশি নয়। স্বামী-স্ত্রীতে এক রকম অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটে। খুব কষ্ট। এমনিভাবে কেটে যায় প্রায় আটটি বছর। কোনরকম প্রাচুর্য নয়, কোনমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য তাঁর সংগ্রাম। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে পড়েন তিনি। জীবনকে আর ধরে রাখা যায় না। এত কষ্ট আর সহ্য হয় না।

জীবন সংগ্রামে নতুন পথের সন্ধানে এরপর শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি চলে যান কোলকাতায়। ৫১ নং মীর্জাপুর স্ট্রীটে একটা দোকান খোলেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারীর। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে শুরু হয় নতুন জীবন। প্রায় সোয়া যুগ তিনি নিজকে এ পেশায় নিযুক্ত রাখেন। এই পেশায় নিযুক্ত থাকাকালে নামের পূর্বে তিনি 'ডাক্তার' পদবী ব্যবহার করেন। এবং তাঁর সাহিত্য জীবনে এই পদবীর সাথেই তিনি খ্যাত হন।

কৈশোর বয়স থেকে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মনে সমাজের অবহেলিত মানুষদের প্রতি যে দরদী অনুভূতির সৃষ্টি হয়, জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর সে অনুভূতির সামান্যতম বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি। বরং বয়ঃবৃদ্ধিতে জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে তাঁর সে অনুভূতি ঐকান্তিক রূপ নিয়েছে। এসব মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদেছে। অস্থির হয়েছেন তিনি আপন দুর্ভাগ্যে। নিজের চরম দুর্দশার মধ্যেও এসব ভাগ্যাহত মানুষের কল্যাণ সাধনে হয়েছেন তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পতিতারা সমাজের অবহেলিত শ্রেণী। সবাই এদেরকে করুণা করে। ঘৃণায় থু থু ছিটায়। এদের মঙ্গলের কথা, পাপমুক্তির কথা কেউ ভাবে না। অথচ সুযোগ এবং সুবিধা পেলে ঘটতে পারে এদের পাপমুক্তি। হতে পারে এদের ভাগ্যের পরিবর্তন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান একথা বুঝলেন একান্ত দরদী মন নিয়ে, সহমর্মী অনুভূতি নিয়ে। তাঁর ডাক্তারীখানার পাশে অবস্থিত এসব পতিতার দুর্ভাগ্যময় জীবন যাপনের ছবি তাঁকে আন্তরিকভাবে পীড়িত করে। তাঁদের মুক্তির জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই বিশেষত এদেরই কল্যাণার্থে এদেরই মুক্তির দিশায় ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি 'নারী তীর্থ' নামে একটি কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। এখানে তিনি এসব নারীর বিভিন্ন প্রকারের সৎ উপজীবিকা শিক্ষা দিতে থাকেন। এগুলির মধ্যে হস্তশিল্প, সূঁচিকর্ম ইত্যাদি অন্যতম। এমনি করে তিনি বহু পতিতাকে অসুন্দর ব্যর্থতার অন্ধকার থেকে সুন্দর আলোকের পথে ফিরিয়ে আনেন। উল্লেখ্য যে, এসব রমণী নব জীবন লাভ করে যতদিন বেঁচেছিল, লুৎফর রহমানকে তারা তাদের জীবনের মুক্তিদাতারূপে সম্মান ও কৃতজ্ঞতায় ভরে রেখেছিল। তাঁকে তারা অতি মানবের আসনে আসীন করেছিল। প্রতিদিন তিনি এসব নারীকে নিয়ে বসে বহু মূল্যবান উপদেশ শোনাতেন। তারা মুগ্ধ হয়ে তা শুনতো। তাদের সুন্দর জীবন গঠনের নতুন পথ খুঁজে নিত। এমনি করে ডাঃ লুৎফর রহমান সমাজের অবহেলিত এক নারী সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিলেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে সমাজ থেকে কম নিগ্রহের পাত্র হতে হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল অটল। সমাজের প্রতি ভালবাসা ছিল তাঁর অকৃত্রিম-পবিত্র। তাই সাধনাতে জয়ী হতে তিনি ব্যর্থ হননি।

কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা অনেক সাধনার অপমৃত্যু ঘটায়। 'নারী তীর্থ' প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যেও তাই জুটলো। আর্থিক দীনতা এবং তার সাথে সামাজিক অসহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে তাঁর স্ত্রীর সম্পাদনায় 'নারী শক্তি' নামে একখানি পত্রিকাও তিনি বের করেন। কিন্তু ওই একই কারণে সেটিও বন্ধ হয়ে গেল।

অবক্ষয়িত গোটা সমাজকে নৈতিক শক্তিতে সঞ্জীবনী দানের জন্য ডাঃ লুৎফর রহমান সাহিত্য চর্চাকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। সাহিত্যের জন্য সাহিত্য চর্চা নয়; বরং সমাজের নৈতিক দুস্থ মানুষের সেবাই ছিল তাঁর সাহিত্য চর্চার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান লিখিত এবং প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'প্রকাশ'। এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, ভালবাসা, নৈতিকতা, চলমান জীবন প্রভৃতি বিষয়ক মোট চল্লিশটি কবিতার সমষ্টি এটি। এ ছাড়া আরও দু'টি কবিতা পরের সংস্করণে সংযোজিত হয়। বাংলা ১৩২২ সাল মুতাবিক ইংরাজী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল ছয় আনা।

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সরলা'। এটি একখানি সামাজিক উপন্যাস। সমাজের অতি সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র চিত্রিত করেছেন তিনি এ

www.pathagar.com

গ্রন্থে। সর্বমোট ২০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানি কোলকাতার ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড থেকে মোহাম্মদী বুক এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৩২৫ সাল, মুতাবেক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। গ্রন্থখানির মূল্য ছিল পাঁচসিকা।

লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'উন্নত জীবন' তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ। মোট ১৫টি অত্যন্ত নীতিগর্ভ প্রবন্ধের সমষ্টি এটি। প্রতিটি প্রবন্ধই মানুষের সুন্দর জীবন গঠনের জন্য এক একটি বীজমন্ত্র। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্য সুধী এবং সংস্কারধর্মী সমাজে ডাঃ লুৎফর রহমানের পরিচিতি ও প্রশংসা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। মোট ১০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানি ১৩২৬ সাল, মুতাবেক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কোলকাতার ১০ নং সারেং লেন থেকে প্রকাশ করে নূর লাইব্রেরী।

এরপর ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় 'রায়হান' নামে তাঁর আর একখানি সামাজিক উপন্যাস। উপরিউক্ত নূর লাইব্রেরী থেকেই একই বছরে এটি প্রকাশিত হয়। মোট ১৯৪পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানির মূল্য ছিল ১।।. (দেড়) টাকা।

'পথহারা' তাঁর লেখা আর একখানি সামাজিক উপন্যাস। এটি তাঁর রচিত পঞ্চম গ্রন্থ। সমাজের অবহেলিত নারী সমাজের কথাই বিশেষভাবে বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ এ উপন্যাসখানিকে 'বাংলা ভাষার প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের পার্শ্বে স্থান পাওয়ার যোগ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এ উপন্যাসের লেখক ডাঃ লুৎফর রহমানকে 'শরৎচন্দ্রের সাথে তুলনা করা চলে'। উপন্যাসখানির উৎকর্ষ, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীই ডাঃ লুৎফর রহমানকে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে। মোট ২০৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানি ১৩২৬ সাল মুতাবেক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কোলকাতার ২৯ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ মোহাম্মদী বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশ করেন মোহাম্মদ সোলেমান খান। উপন্যাসখানির মূল্য ছিল পাঁচ সিকা।

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের ৬ষ্ঠ গ্রন্থ 'মহৎ জীবন'। লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম। 'উন্নত জীবন'–এর মত এ গ্রন্থখানিও তাঁকে সুধী সমাজে বিশেষ পরিচিতি প্রদানে সহায়ক হয়। 'মহৎ জীবন', 'কাজ' ও 'ভদ্রতা' শীর্ষক তিনটি অত্যন্ত উপদেশপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সমন্বয় এ গ্রন্থখানি। ১১৯ পৃষ্ঠার এ মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সাল মুতাবিক ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। প্রকাশকের নাম জানা যায়।

সপ্তম গ্রন্থ 'প্রীতি উপহার' একখানি পারিবারিক উপন্যাস। মূলত এদেশের নারী সমাজের জন্যই তিনি এটি রচনা করেন। নারীদের চাল–চলন, আচার–আচরণ, স্বভাব–চরিত্র ইত্যাদি কেমন হওয়া উচিত—তারই গাল্পিক বর্ণনা আছে এ

www.pathagar.com

উপন্যাসে। মোট ২৬৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে, মুতাবিক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। প্রকাশক মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা। গ্রন্থখানির মূল্য ছিল বার আনা।

পরবর্তী গ্রন্থ 'মানবজীবন'। উন্নত জীবন' ও 'মহৎ জীবন'–এর মত এটিও একটি উন্নত শ্রেণীর উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ–গ্রন্থ। মোট ১৩টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে গ্রন্থখানি রচিত। প্রতিটি প্রবন্ধই যে কোনো মানবের জীবনের জন্য অত্যন্ত সুন্দর পথনির্দেশক। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সাল, মুতাবিক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক ছিলেন মঈনুদ্দীন আহমদ। এটি প্রকাশিত হয় যশোর থেকে।

'ছেলেদের মহত্ত্ব কথা' তাঁর নবম গ্রন্থ। ছোটদের জন্য অত্যন্ত সুন্দর, প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় রচিত এটিও একটি উপদেশমূলক গ্রন্থ। জীবনে বড় হওয়ার জন্য পথনির্দেশ আছে এ গ্রন্থে। অবশ্য এটি একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৫৬। ১৩৩৪ সাল মুতাবিক ১৯২৮ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন আব্দুল আজিজ তালুকদার। গ্রন্থটির মূল্য ছিল আট আনা।

'ছেলেদের কারবালা' নামে তাঁর একখানি শিশুগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সাল মুতাবিক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। প্রকাশিত হয়েছিল কোলকাতার করিম বক্‌শ ব্রাদার্স থেকে। এটিও একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ। মূল্য ছিল ছয় আনা।

তাঁর রচিত একাদশতম গ্রন্থ 'রাণী হেলেন'। এটিও একটি শিশুগ্রন্থ। হোমারের 'ইলিয়ড' কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ বর্ণনায় ছোটদের জন্য এ গ্রন্থখানি তিনি রচনা করেন। ইংরাজী ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কোলকাতার করিম বক্‌শ ব্রাদার্স থেকে ১০৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল আট আনা।

'বাসর উপহার' ডাঃ লুৎফর রহমান রচিত আর একখানি সামাজিক উপন্যাস। এটিও বিশেষ করে এ দেশের নারী সমাজের জন্য রচিত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থখানি বৃহৎ কলেবরের। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৮। যশোর থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে।

এ গ্রন্থখানি তার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা আরও দু'খানি গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে 'সত্য জীবন'। এটি একটি নীতিকথামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ। ১০৭ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর থেকে প্রকাশ করেন তাঁরই সমসাময়িক প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী। গ্রন্থখানির মূল্য ছিল আট আনা।

'উচ্চ জীবন' ও তাঁর রচিত আর একখানি নীতি–উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থ। বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কিছুসংখ্যক মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন এটি। সংকলন

www.pathagar.com

করেন সালেহা খাতুন। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী থেকে এটি প্রকাশিত হয়। মোট ৮৭ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানির মূল্য ছিল দু'টাকা।

এ ছাড়াও দু'টি বিদেশী উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে তিনি আরও দু'খানি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথমখানি ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারেবল অবলম্বনে রচিত 'দুঃখের রাত্রি'। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত উপন্যাসখানি 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকায় ১৩৩৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১৩৪০ সালের আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

অন্য উপন্যাসখানির নাম 'মঙ্গল ভবিষ্যৎ'। একটি ফরাসী উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে এটি রচিত। একবিংশ অধ্যায়ের এ উপন্যাসখানি 'মাসিক মোহাম্মদী'তে ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

এ ছাড়াও তিনি বেশ কিছু ছোটগল্পও রচনা করেছিলেন, যেগুলি বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান একজন মানবপ্রেমিক সমাজদরদী লেখক ছিলেন। মানুষের নৈতিক অবক্ষয় দেখে তিনি শংকিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই অবক্ষয় থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আত্মার উদ্বোধন। যার জন্য প্রয়োজন নৈতিক শক্তির জাগরণ। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কলম ধরেছিলেন। শত দরিদ্রতার মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান পুরুষ। আর সেই আদর্শই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন একটা গোটা জাতির মধ্যে। এমনিভাবে গড়তে চেয়েছিলেন একটি গোটা দেশ। তাঁর লেখা ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সবগুলিতেই তাঁর এই আদর্শ সরবে প্রকাশিত হয়েছে। নিজের সাহিত্য খ্যাতির জন্য নয়, সমাজের অতি সাধারণ মানুষের জন্যই ছিল তাঁর সাহিত্য চর্চা। তাই তাঁর সমগ্র রচনার একটি বাক্য অথবা শব্দও দুর্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট নয়। বরং ভাষা এবং বক্তব্য যেন অতি সাধারণ ব্যক্তির প্রতিদিনকার রোজনামচার ভাষা।

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান একদিন তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন–'আমি আমার এবং তোমাদের জন্য বেশি কষ্ট করি না। আমি বেশি কষ্ট অনুভব করি এ দেশের নিরণ্ন–নিরীহ–অসহায় এবং অবহেলিত মানুষের জন্য। এদের জন্য যদি আমি কিছু করতে না পারি, তবে আমার জন্ম বৃথা হবে। আর এই ব্যর্থতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে পারিব না। আমি এমন একটা আদর্শ রাখিয়া যাইতে চাই, যাহা আমার মৃত্যুর পরেও যুগ যুগ ধরিয়া অনুপ্রেরণা যোগাইতে পারে।'

বস্তুত ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সাহিত্যের মাধ্যমে সেই আদর্শই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে কাজ

www.pathagar.com

করে গেছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে জাতিকে জাগরণের প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। কেউ সফল হয়েছেন, কেউ হননি। কিন্তু একজন সমাজসেবী সাহিত্যিক হিসেবে ডাঃ লুৎফর রহমানের কৃতিত্বের সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। অবক্ষয়িত জাতির নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য সাহিত্যের যে কলা-কৌশলকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, আমাদের বাংলা সাহিত্যে তার দ্বিতীয় নজীর নেই।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সমাজদরদী, মানবহিতৈষী এই ব্যক্তিটি সারাটি জীবনই চরম দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ করতে করতে জীবন ধ্বংসকারী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তারপর বিনা চিকিৎসায় দীর্ঘদিন ধুঁকে ধুঁকে ৪৭ বছর বয়সে ১৯৩৬ সালের ২৩শে মার্চ তাঁর প্রাণপ্রিয় সমাজ ও মানুষের কাছ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

এস. ওয়াজেদ আলী

মুসলিম বাংলা সাহিত্যে যে দু'জন ওয়াজেদ আলীর মূল্যবান সাধনায় সমৃদ্ধ, তাঁদের একজন হচ্ছেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও অপরজন এস. ওয়াজেদ আলী। দু'জনই সমসাময়িক। দু'জনারই সাহিত্যচর্চার বিষয় একই। সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু মাধ্যম এক হলেও পথ ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র। উল্লিখিত প্রথমজন ছিলেন শুধুমাত্র প্রবন্ধকার। দ্বিতীয়জন একসাথে প্রবন্ধের সাথে গল্পকারও বটে। তা ছাড়া প্রথমজন শুধুমাত্র মুসলিম কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ দেশের মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তোলার সাধনায় ব্যাপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয়জনের চিন্তা ও সাধনা ছিল আরও একটু প্রসারিত। মুসলিম কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে সাথে যুক্তিবাদী মন ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার বিকাশে দিগভ্রান্ত মুসলিম সমাজকে দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট পথের ইংগিত। অধিকতর উচ্চ শিক্ষাই তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল—এ ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করা হয়তো অন্যায় হবে না। তাঁর রচনাবলীতেই সে স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

ইংরাজী ১৮৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার বড় তাজপুর গ্রামে এস. ওয়াজেদ আলীর জন্ম। মৃত্যু ১৯৫১ সালের ১০ই জুন। শিশুকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ক্যাব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করার পর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫ সালে তিনি ব্যারিস্টারী পাস করেন। এরপর কোলকাতার প্রেসিডেন্সী মেজিস্ট্রেট পদে যোগদান করার পর দীর্ঘদিন যাবত কঠোর নিষ্ঠা এবং সুদৃঢ় প্রত্যয়, দক্ষতা ও সুবিবেচনার সাথে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালে উক্ত চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আইন ব্যবসা শুরু করেন। দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকেই তিনি নিরস সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন।

ঐতিহ্যহারা বাঙালি মুসলমানদের পুনঃ সমৃদ্ধি প্রদানের লক্ষ্যই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনা। এজন্য প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে ইসলামের মহত্তম প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব মানবতা আর সাম্যই হচ্ছে মানব মুক্তির একমাত্র পথ। এর জন্য প্রয়োজন উন্নত জীবন গঠন, যা

www.pathagar.com

সম্ভব শুধুমাত্র ইসলামের মাধ্যমে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন—বিশ্বে একমাত্র ইসলামই সেই ধর্ম, যা পারে বিশ্বে সকল মানুষকে একটি মহত্তম আদর্শের সূত্রে গ্রথিত করে গোটা বিশ্বকে একটি কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। গোটা বিশ্বকে সর্ব শ্রেণীর মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর কোনো বিকল্প পথ নেই। ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে এই মহৎ চিন্তাধারাই ছিল তাঁর সাহিত্যচর্চার অনুপ্রেরক।

তৎকালীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাতে অনুরূপ আদর্শমূলক প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়। এসব পত্রিকার মধ্যে সওগাত, মোহাম্মদী, নওরোজ, বঙ্গবাসী, ভারতী, সাহিত্যিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'তেও তিনি লিখেছেন অজস্র। 'গুলিস্তাঁ' নামে একখানি সাহিত্য পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। নিজেই তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। এসব পত্রিকাতে তিনি একাধারে লিখেছেন ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। এবং তা অত্যন্ত শক্তিশালী হাতে।

তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলোতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় যতখানি তিনি যত্নবান হয়েছেন, তারচেয়ে বেশি যত্নবান হয়েছেন আদর্শ প্রচারণায়। তাঁর লেখা ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই সাহেব বলেছেন-'ছোটগল্পের কাহিনী ও আবহের চেয়ে সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা তাঁর কাছে বেশি সত্য। তাঁর গল্পগুলোতে চরিত্র চিত্রণ নেই, মানুষের জীবনের কর্মচঞ্চল দিকের খণ্ড ক্ষুদ্র অংশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই, তাঁর গল্পের আবহের গতি নির্ধারণ করেছে তাঁরই জীবানুভূতি ও ভাবাদর্শ।' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর গবেষণায়-'তিনি ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষার চেয়েও অন্তর্নিহিত বক্তব্য উপস্থাপনের দিকেই অধিক দৃষ্টি রেখেছেন।' তাঁরই মতে-'তার জীবনানূভূতি ও ভাবাদর্শ. . . গল্পের আবহ নির্ধারণ করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।'

সার্বজনীন ইসলাম ধর্মের শক্তি ও মাহাত্ম্যই যে ছিল তাঁর জীবনানুভূতি ও ভাবাদর্শ, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই আদর্শেই রচিত তাঁর বেশ কিছু-সংখ্যক গল্প-গ্রন্থ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দরবেশের দোয়া', 'মাসুকের দরবার', গুলদাস্তা,' 'ভাঙ্গা বাঁশী', 'প্রেমের মুসাফির', 'ফেরেশতাদের কলহ', 'নবী দর্শন', 'খেয়ালের ফেরদৌস,' 'ইরান তুরানের গল্প', 'বাদশাহী গল্প,' 'গল্পের মজলিশ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি।

এরমধ্যে 'ভারতবর্ষ' একটি বিশাল আকারের গ্রন্থ; এবং একে ঠিক ছোটগল্প গ্রন্থ না বলে ছোটগল্পের আংগিকে একজন দক্ষ কথাশিল্পীর লেখা মননশীল প্রবন্ধ গ্রন্থ বলা

www.pathagar.com

শ্রেয়। গ্রন্থখানি এক সময় এদেশীয় সর্বশ্রেণীর এবং সর্ব ধর্মের পাঠক সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ওই একই জীবনানুভূতি ও ভাবাদর্শে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ভবিষ্যতের বাঙালি ' গ্রন্থে স্ব স্ব ধর্মীয় স্বকীয়তা রক্ষা করেও হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি বন্ধনের কথা তিনি ভেবেছেন। 'সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান' গ্রন্থে তিনি ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য, আল্-কুরআনের বিশ্বস্ততা ও বিশ্বনবীর সত্যতাকে প্রমাণ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর গৌরবময় ঐতিহ্য ও গুণগত শক্তি ও মাহাত্ম্যের নজীরও তিনি উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। 'আকবরের রাষ্ট্র সাধনা' প্রবন্ধ-গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের শাশ্বতরূপ ও চিরসত্য ভিত্তিকে তিনি সুদৃঢ় প্রত্যয়ে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন পথভ্রষ্ট বাঙালি মুসলমান সমাজকে।

একই আদর্শে রচিত এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে 'জীবনের শিক্ষা', 'ইসলামের ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মুসলিম জীবন-কাহিনীর মধ্যে 'সুলতান সালাদীন', 'গ্রানাডার শেষ বীর' প্রভৃতি বাংলা জীবনী-সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। প্রথমটি জার্মান থেকে ইংরাজী অনুবাদের ভাবানুসরণে রচিত একখানি ঐতিহাসিক নাটক। দ্বিতীয়টি শেষ মুসলিম সুলতানের শৌর্যের কাহিনী।

এস. ওয়াজেদ আলীর লেখা সর্বমোট ১৯খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য অনুবাদক, গবেষক জনাব জাফর আলম তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০খানি বলে উল্লেখ করলেও ১৬খানির বেশি নামোল্লেখ করতে পারেন নি।

তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মনীষীর জীবন-চর্চায় তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদ মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর দর্শন তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এ ছাড়া ইমাম গাজ্জালী, মীর্জা গালিব, শেখ সাদী, হাফিজ, আমীর খসরু, হালী প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদের সম্পর্কে তিনি বিস্তর পড়াশুনা করে তাঁদের আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হন, যা তাঁর সাধনার উজ্জীবনে সহায়ক হয়।

এস. ওয়াজেদ আলী ছিলেন ইসলামের মহান মানবতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী এবং সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার উর্ধ্বে একজন আদর্শবান সমাজসেবক লেখক। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্প্রীতি। কিন্তু তা স্বীয় ধর্মের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে নয়। তিনি উভয় ধর্মের সম্মিলন চাইলেও সংমিশ্রণ চাননি। একজন স্বধর্মপ্রেমিক আদর্শ মানব হিসেবে এটা ছিল তাঁর এক অনন্য গুণ।

www.pathagar.com

হতাশাগ্রস্ত দীনতায় জর্জরিত বাঙালি মুসলিম সমাজের মুক্তির জন্য বাঙালি মুসলিম তরুণ সমাজের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা। তাই ১৯৩৩ সালে মাসিক 'সওগাত'-এ 'তরুণের কাজ' প্রবন্ধে বাঙালি মুসলিম তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আহবান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন- 'আপনারা হচ্ছেন সমাজের তরুণ সম্প্রদায়। আমাদের আশা-ভরসার স্থল। আমাদের ভবিষ্যৎ আপনাদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উৎকর্ষের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। আপনারা যদি আশানুরূপ কার্য কুশলতা দেখাতে না পারেন, আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের দৈন্যদশা তাহলে কখনও ঘুচবে না।'

আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে দেশের তরুণ মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর সেই আহবানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন কি এখনও শেষ হয়ে গেছে?

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বাঙালি মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য জীবনের সকল সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে চরম দুঃখ, ক্লেশ আর দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে যে কয়জন মুসলমান সাহিত্যসেবী লেখনী ধারণ করেছিলেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁদের অন্যতম।

ইংরাজী ১৮৯৬ সাল, মুতাবিক বাংলা ১৩০৩ সনের ২৮শে ভাদ্র তৎকালীন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহাকুমার (বর্তমান জেলা) বাঁশদহ গ্রামে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর জন্ম। পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ ইবরাহীম। মা মোসাম্মাৎ শামসুন্‌নেছা।

তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তাই স্বগৃহেই তাঁর পবিত্র কুরআন শিক্ষা শুরু হয়। সাথে সাথে চলতে থাকে ধর্মীয় জীবনের অনুশীলন।

অল্প বয়সেই তাঁর পিতা তাঁকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। এরপর স্থানীয় বাবুলিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স (বর্তমান এস. এস. সি.) পরীক্ষা পাস করে ভর্তি হন কোলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের এফ. এ. শ্রেণীতে।

উচ্চ প্রতিভার জন্য উক্ত কলেজের অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবু তাঁর শিক্ষা জীবন বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। কারণ, এ সময় বাঙালি মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষার জন্য তিনি আকুল হয়ে ওঠেন। তখন মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন এদেশীয় মুসলিম পুনর্জাগরণের একজন অগ্রদূত। তাঁরই নেতৃত্বে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মত একজন প্রতিভাবান মুসলিম দরদী সমাজকর্মী যুবককে পেয়ে মওলানা আকরম খাঁ যেন অনেকখানি নির্ভরতা লাভ করলেন। সে সময় মওলানা সাহেবের প্রকাশনায় 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকাটি ছিল দেশের মুসলিম সমাজের একমাত্র মুখপত্র। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে তিনি যোগ্যতর কর্মী হিসেবে উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে চাকরি দেন।

www.pathagar.com

'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে চাকরি গ্রহণ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর পক্ষে পরম আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। কারণ, এই পত্রিকার মাধ্যমেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবীদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। এ আশীর্বাদ আর সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী হলো না। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সাথে মতের অমিল হওয়ায় একদিন তাঁকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে হলো।

বেকার হয়ে তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস করলেন না কারও সাথে। তাই কোথাও একটা সাশ্রয় হলো না। কিন্তু তবু সমাজ-সেবার মানসিকতায় তাঁর বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়েনি। চরম দারিদ্র্য আর দুর্ভোগের মধ্যেও সব সময় তাঁর সাধনা, কেমন করে হতাশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে তিনি সহায়তা দান করবেন। আত্ম-ভাবনার চেয়ে সমাজ ভাবনায় তখনও তিনি নিমগ্ন।

কথায় বলে, রতনে রতন চেনে। শেরে বাংলা এ. কে, ফজলুল হক চিনলেন তাঁকে। তার প্রকাশিত 'নবযুগ' পত্রিকাতে সমাজ দরদী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে তিনি ডেকে নিলেন। সেটা ১৯১৯ সালের কথা। সাময়িক অনাদর হলেও রত্ন সে রত্নই। সমাদর তার হবেই। বিশেষ করে গুণীজনের কাছে। তাই কিছুদিনের মধ্যে আবার ডাক এলো 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে। সেখান থেকে আবার 'সেবক'-এর সহ-সম্পাদক। আবার 'সেবক' থেকে ত্রৈমাসিক 'সাম্যবাদী'র সম্পাদক। যোগ্যতার যোগ্যতর সম্মান।

'সাম্যবাদী'র সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে এদেশের মুসলিম সমাজের সেবার পথ তাঁর কাছে অনেকখানি সহজতর হয়ে গেল। কারণ, সে সময় 'আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে কওম' নামে একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান ছিল। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় অধঃপতিত মুসলমানদের সেবা করা। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক মওলবী সানাউল্লাহ। 'সাম্যবাদী' ছিল এই প্রতিষ্ঠানেরই মুখপত্র। তাই পত্রিকাটির মাধ্যমে আপন সাধনার রূপায়ণ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে।

এরপর হঠাৎ করে তিনি কিছুদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য, এ অসুস্থতা শারীরিকের চেয়ে মানসিকই ছিল বেশি। কারণ, পত্রিকায় চাকরিকালে তিনি দারুণ আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন।

যা হোক, শারীরিক সুস্থতা লাভের পর প্রখ্যাত সাংবাদিক মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেবের প্রচেষ্টায় একই সাথে তিনি 'দি মুসলমান' ও 'খাদেম' নামে দু'টি পত্রিকাতে চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু বেতন সামান্য হওয়ায় সংসারে সচ্ছলতা

www.pathagar.com

আসেনি। এ সময় তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কোলকাতার ১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে সাপ্তাহিক 'সওগাত'কে কেন্দ্র করে একটি বিপ্লবী সংসদ গড়ে ওঠে। যার প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন উক্ত সংসদের অন্যতম নিষ্ঠাবান কর্মী। যে সাপ্তাহিক 'সওগাত'–এর মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার সম্পাদনার ভার পড়ে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ওপর। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এখানে তিনি দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পত্রিকাটির মাধ্যমে মুসলিম সমাজসেবামূলক যে আন্দোলনটি গড়ে ওঠে, তা ক্রমে ক্রমে গোটা দেশের বুকে প্রসার লাভ করে।

এ সময় ঢাকাতে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদও উক্ত সমিতির একজন সদস্য হিসেবে মুসলিম পুনর্জাগরণের দূত হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

এ ছাড়াও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'–এর মুখপত্র 'শিখা', জনাব হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন্নাহার মাহমুদের যুগল সম্পাদিত 'বুলবুল'সহ তৎকালীন মুসলিম কৃষ্টিমূলক বলিষ্ঠ সাংবাদিকতায় তাঁর দক্ষতা এত বেশি ছিল যে, উপরিউক্ত পত্রিকাসমূহ ছাড়াও আরও বিভিন্ন সমাজ বিপ্লবী পত্রিকার প্রকাশকগণ তাঁদের পত্রিকার সম্পাদনার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য সেসব ভার গ্রহণে তিনি সক্ষম হননি। এসব পত্রিকার মধ্যে 'ইত্তেহাদ', 'নবযুগ', 'পল্লী পয়গাম', 'কৃষক' প্রভৃতি অন্যতম।

মুসলিম সমাজসেবক ও সাহিত্যিক হিসেবে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। বহুসংখ্যক পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। প্রায় সবগুলিই প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের মাহাত্ম্য ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনীতে উপজীব্য।

তাঁর লেখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'মরু ভাস্কর'। এটি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর জীবনী। মহানবী (সা)–র জীবন ও জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক এতে আলোচিত হয়েছে। জনাব হাবীবুল্লাহ বাহারের প্রকাশনায় ১৯৪১ সালে কোলকাতা থেকে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এটি তৎকালীন মুসলিম সমাজে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত হয়।

'স্মার্না'–নন্দিনী' তাঁর দ্বিতীয় জনপ্রিয় গ্রন্থ। এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটির নাম ছিল 'ডটার অব স্মার্না'। লেখিকা মাদাম হালিদা এদিব হাকুম। তুরস্কের অধিবাসিনী তিনি। তুরস্ক নন্দিনী আয়েশার মাহাত্ম্যময় কাহিনীই এতে বর্ণিত

www.pathagar.com

হয়েছে। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। এগুলোর মধ্যে 'সিন্দবাদ হিন্দবাদ', 'ছোটদের হযরত মোহাম্মদ', 'মহামানুষ মুহসিন', 'ছোটদের হাতেমতায়ী', 'ছোটদের শাহনামা', 'সৈয়দ আহমদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো সবই কোলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং প্রকাশকাল ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে। 'মণি চয়নিকা' নামে তাঁর লেখা আর একখানি ইসলামের মহত্ত্ব কথামূলক কিশোর গ্রন্থ ১৯৫১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া তাঁর লেখা আরও কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি রয়ে গেছে, যেগুলো প্রকাশিত হয়নি। এগুলোর মধ্যে 'মোহাম্মদ আলী,' 'হারুন-অর রশীদ', 'কবি কাজী নজরুল ইসলাম', 'নবাব আব্দুল লতীফ' প্রমুখ অন্যতম। চেষ্টা করলে পাণ্ডুলিপিগুলো উদ্ধার করা যেতে পারে। তাঁর সকল রচনাই বাঙালি মুসলমানের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণায় রচিত-একথা উল্লেখ করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৩৫ সালে কোলকাতা থেকে তিনি স্বগ্রাম সাতক্ষীরার বাঁশদহে ফিরে যান। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সেখানে তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি কাটে। ১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও নিরলসভাবে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন তিনি। তাঁর সে সাধনা ছিল এ দেশীয় মুসলমানদের সেবায় নিবেদিত। নিজের জন্য জীবনে তিনি কিছুই করে যেতে পারেন নি, হয়তো তার জন্য কোন চেষ্টাও তিনি করেন নি। কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এক জাতি ও সমাজের জন্য অনেক কিছুই করে গেছেন তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে। জীর্ণ কুটিরের মধ্যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেও নিয়ে গেছেন জাতির কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। মানব ও জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবনে এরচেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি আছে?

www.pathagar.com

কংকালের কবি আশরাফ আলী খান

নিষ্কলুষ সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে যাঁরা একদিন এ দেশের অবহেলিত অধঃপতিত সমাজকে জাগিয়ে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন, সর্বশ্রেণীর মানুষকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে আত্মচেতনার বীজ উপ্ত করে নতুন পথের ইংগিত দিতে প্রত্যয়ী হাতে কলম ধরেছিলেন, কবি আশরাফ আলী খান তাঁদের অন্যতম। মূলত 'কংকালের কবি' নামেই তিনি পরিচিত। কবি আশরাফ আলী খান নামের সাথে এ দেশের পাঠকরা তত বেশি পরিচিত নাও থাকতে পারেন, কিন্তু 'কংকালের কবি'কে অনেকেই চেনেন।

তদানীন্তন যশোর এবং বর্তমানের ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গার পানাইল গ্রামে ১৯০১ সালের আগস্ট মাসে কবি আশরাফ আলী খানের জন্ম। বাংলা ১৩০৮ সালের ১০ ভাদ্র।

অতি শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দুরন্তপনা ছিল সমাজের অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে এবং অত্যাচারিত মানুষের স্বার্থে। তাই শৈশবের এ দুরন্তপনার মাধ্যমেই শুরু হয় তাঁর সমাজসেবার ভূমিকা।

সমাজসেবা ও আন্দোলনের মধ্য থেকে তিনি সাহিত্য চর্চার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় বিভিন্ন পত্রিকাতে তাঁর লেখা কিছু কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। এ সব কবিতা ছিল দেশপ্রেম ও সমাজ-হিতৈষীমূলক। বখতিয়ার, মানুষ চাই, গাজী আব্দুর রশিদ ইত্যাদি এ জাতীয় কবিতাসমূহের অন্যতম। কবিতাসমূহের নামকরণেই বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট। এ দেশের ঝিমিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে অনুপ্রেরণা দিয়ে 'বখতিয়ার' কবিতায় তিনি বলেছেন-

'তোদেরো মাঝে হাজার হাজার
করিম কামাল শের আকবর,
রয়েছে ঘুমায়ে তোল জাগায়ে
ঘোরী, গজনী, বখতিয়ার।
বেশি দূর নাহি মুক্তি আর।।'

www.pathagar.com

'মানুষ চাই' কবিতার মধ্যে কবি দেশের ও সমাজের শান্তির জন্য এমন মানুষ কামনা করেছেন, যিনি হবেন ত্যাগী, সিদ্ধ এবং শান্তিময় ধর্মের প্রতীক। যাঁর সাহচর্যে সমাজের প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠবে আলোকিত। অন্ধকার দূর হয়ে যাবে প্রতিটি রন্ধ্র থেকে।

কবি আশরাফ আলী খানের লেখা বহুসংখ্যক কবিতার সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা সে তুলনায় বেশি নয়। 'ভোরের কুহু' তাঁর প্রকাশিত প্রথম পুস্তক। এটি বেশ কিছুসংখ্যক গান ও ইসলামী গজলের সমষ্টি। এ গজলগুলো পাঠে বোঝা যায়, মহানবী হযরত রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি তাঁর কত গভীর ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। আল্লাহ্ ও তাঁর নবীকে অকৃত্রিমভাবে ভালবেসে তিনি জীবনকে পূর্ণত্ব দিতে চেয়েছিলেন। এ ভালবাসার কাছে বেহেশতের শান্তি এবং দোযখের যন্ত্রণা তুচ্ছ। তাঁর প্রতিটি গজলের মূল আবেদন এটাই। 'ভোরের কুহু' পুস্তকটির প্রকাশের সঠিক তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে এটি যে তাঁর লেখা প্রথম পুস্তক এবং এর প্রকাশকাল যে ১৯২৫ সালের পরে নয়, এ ধারণার স্বপক্ষে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে।

'শেকোয়া' তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক। এটি ইকবালের বিখ্যাত উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'শেকোয়া'র কাব্যানুবাদ। ধর্মীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কবি এটি অনুবাদ করেন। অনুবাদ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সাবলীল। পুস্তকখানি তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। এ পুস্তকখানি তিনি কাজী নজরুল ইসলামের নামে উৎসর্গ করেন।

প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী এবং মুসলিম শৌর্যবীর্যের প্রতীক আফগান সুলতান আমানুল্লাহর জীবন-কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা করেন 'গাজী আমানুল্লাহ' কাব্যগ্রন্থখানি। এতে বাদশাহ আমানুল্লাহ্র জীবনাদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে এদেশের মুসলিম সমাজকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন। জীবনে একমাত্র ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তিনি সেই কথাই বিবৃত করেছেন। ১৯২৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বশেষ পুস্তক 'মোয়া'। এটি ছোটদের জন্য লিখিত একটি ছড়া, কবিতা ও ছোটগল্প সংকলন। এসব ছড়া, কবিতা ও ছোটগল্প ছোটদের জন্য মূল্যবান উপদেশমূলক। শিশুদের মধ্যে এ পুস্তকখানি বেশ সমাদৃত হয়। এটি তিনি সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ কাসেমকে উৎসর্গ করেন।

আগেই বলা হয়েছে, কবি আশরাফ আলী খান তাঁর স্বনামের চাইতে 'কংকালের কবি' নামেই সমধিক পরিচিত। একজন বেকার যুবকের করুণ জীবনালেখ্য তাঁর 'কংকাল' কাব্যগ্রন্থটি। একজন বেকার যুবক সংসার জীবনে অভাবের তাড়নায় দগ্ধ হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে কোন রকমে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। গেছে তথাকথিত সমাজকর্মী খান বাহাদুরের কাছে, বিভিন্ন তথাকথিত কর্ণধারের কাছে,

www.pathagar.com

সমাজের সর্বস্তরের গুণীজনের কাছে কিন্তু কারও কাছ থেকে সে বিন্দুমাত্র সাহায্য অথবা করুণা পায়নি। সবাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বঞ্চিত করেছে বিভিন্ন অজুহাতে। এমনি করে প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে ঘুরে সে দেখেছে মানুষ নামের ভণ্ড ব্যক্তিবর্গকে। মানুষ্যত্বকে কোথাও সে খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত মুনষ্যত্বহীন সমাজ তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। যার চরম পরিণতি তাকে গ্রাস করেছে।

কে এই কংকালের বেকার অসহায় যুবকটি? এটি কবি নিজেই? হয়তো তাই। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পর্যালোচনা ও শেষ পর্যন্ত করুণ পরিণতি দেখে সেটাই অনুমান করা সংগত।

আলোচ্য কয়টি পুস্তক ছাড়াও কবির আরও বেশ কিছুসংখ্যক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলোর প্রত্যেকটিতে কবির সমাজ হিতৈষী মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

'অহঙ্কারী' নামে একটি উপন্যাস রচনা এবং কুরআন শরীফের আম্পারার অনুবাদ কার্যে তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি।

সমাজসেবার জন্য সাংবাদিকতাকে তিনি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি প্রকাশ করলেন 'বেদুঈন' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন অসুবিধার জন্য পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩২ সাল থেকে পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে সাপ্তাহিকরূপে। বেশ কিছুদিন এটি চালু থাকে। এর প্রতিটি সংখ্যাতে কবির স্বনামে ও বেনামে বহু ইসলামী কবিতা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা থেকে সমসাময়িক মুসলিম সমাজ অনেকখানি অনুপ্রাণিত হয়।

এ ছাড়া ১৯২৮ সাল থেকে 'দৈনিক সুলতান'-এর সাথে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। উক্ত পত্রিকাতেও স্বনামে-বেনামে তাঁর লেখাগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এদেশীয় অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করে তুলতে 'দৈনিক সুলতান' তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি 'নওজোয়ান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর নিজের হাতেই ছিল। এ ছাড়া 'রক্তকেতু' ও 'কৃষক প্রজা' পত্রিকা দু'টির সাথে জড়িত থেকে তিনি এদেশীয় অধঃপতিত সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দান করতে থাকেন।

তাঁর বেশ কিছু প্রত্যক্ষ সমাজসেবামূলক কার্য উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত ভগ্নপ্রায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল

www.pathagar.com

স্কুল'কে সাহায্য করে এটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। ১৯২৬ সালে বালুরঘাট, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের বন্যা দুর্গতদের মাঝে সশরীরে হাযির হয়ে আর্থিক ও কায়িকভাবে সাহায্য করে সবার প্রিয়ভাজন হন। এ ছাড়া বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে তিনি সমাজসেবকরূপে সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

অবর্ণনীয় দারিদ্র্য আর অনটনের মধ্যে তিনি সারাটি জীবন কাটান। একটা গোটা সমাজকে সুখী–সমৃদ্ধিশালী করাই ছিল যাঁর সাধনা, তাঁর গোটা জীবনটাই কেটে গেছে চরম দুর্গতির মধ্যে। সে দুর্গতির যন্ত্রণাকে শেষ পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাই ১৯৩৯ সালের ১৯ নভেম্বর আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে 'কঙ্কালের নায়ক' আশরাফ আলী খান বঞ্চনা–বিক্ষুব্ধ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

কবি আশরাফ আলী খানের লেখা কোনও পুস্তক এখন বাজারে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর নামও আজ অনেক সুধীজনের কাছে অজ্ঞাত। যিনি গোটা জীবনের সাধনা দিয়ে সমাজকে এত কিছু দিয়ে গেলেন, সেই সমাজে তাঁর পরিচিতি আজ লুপ্তপ্রায়। তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হলে তাঁর সম্বন্ধে জাতি সম্যকভাবে অবহিত হতে পারেন।

ইফাবা–১৯৯৭–৯৮–প্র/৬০৭৭(উ)–২২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ